প্রাপ্ত বয়স্ক উপন্যাস

প্লেক্সাস

মূলঃ হেনরি মিলার

অনুবাদঃ আবু কাওসার



প্রাপ্ত বয়স্ক উপন্যাস

প্লেক্সাস

মূলঃ হেনরি মিলার

অনুবাদঃ আবু কাওসার

দিগ্-বিজয়ী কথাশিল্পী হেনরী মিলার-এর বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ট্রিলজি' "দি রোজী ক্রুশিফিক্সিয়ন"-এর প্রতিটি বই প্রকাশের সাথে সাথেই ঝড় তুলতো পশ্চিমা সমাজে। লক্ষ লক্ষ পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়তো। সমালোচকরা হতো আরো কঠোর। আর তাই সেক্সাস, নেক্সাস, প্লেক্সাস প্রতিটি বই-ই অশ্লিলতার অভিযোগে আবদ্ধ হয়েছিল নিষিদ্ধতার শৃঙ্খলে। আবার জনপ্রিয়তা-ই মুক্ত করেছে সেই শৃঙ্খল।

বাংলাদেশে অধুনা প্রকাশন থেকেই 'ট্রিলজি'র প্রথম দু'টি বই সেক্সাস ও নেক্সাস প্রকাশিত হয়। এখানেও সমালোচকরা হয়ে ওঠেন সোচ্চার। কঠোর সমালোচনায় বাধার সম্মুখীন হয় তৃতীয় বইটির প্রকাশনা। কিন্তু পাঠকের মতামত-ই সর্বাগ্রে। পাঠকদের উপর্যোপুরি অনুরোধেই প্রকাশিত হলো 'ট্রিলজি'র সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় উপন্যাস প্লেক্সাস।

সম্ভবতঃ এটাই হবে এদেশ থেকে প্রকাশিত হেনরী মিলারের সর্বশেষ উপন্যাস।

অধুনা পেপারব্যাক
প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস—
কাহিনী : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রকাশকাল : মে ১৯৮৯
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক :
অধুনা প্রকাশনের পক্ষে
ফরিদ আহমেদ
২০ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

মুদ্রণ :
সুরমা আর্ট প্রেস
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
হামিদুল ইসলাম

পরিবেশক :
কারেন্ট বুক সাপ্লাই নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা। ঢাকা হকার্স সমবায় সমিতি লিঃ। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিশার্স বাংলাবাজার, ঢাকা। মিশুক প্রকাশনী, কারেন্ট বুক সেন্টার চট্টগ্রাম। ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো রাজশাহী। এছাড়াও দেশের সর্বত্র বুকস্টল ও ম্যাগাজিন কর্নারসমূহে পাওয়া যায়।

১

অ'াটসাট পার্সিয়ান পোশাকে ওকে মনে হচ্ছিলো মনো-হারিনী। মাথায় জড়ানো স্কার্ফটা ওর সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ করেছে। বসন্ত এসে গেছে। ওর মরালের মতো গ্রীবা ছুঁয়ে, কাঁধের উপর আলতো ভাবে পড়ে আছে লম্বা দস্তানা আর কার কোটটা। ব্রুকলীন হাইট্‌সে একটা বাসা খুঁজছি আমরা। কেননা চেনাজানা প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে চাই। বিশেষ করে ক্রাউস্কি আর আর্থার রেমণ্ডের। উলরিকই হচ্ছে একমাত্র লোক— যাকে আমাদের নতুন অ্যাপার্টমেণ্টের ঠিকানা দেবো বলে ভেবে রেখেছি। এটাই হবে আমাদের সত্যিকার গোপন গুহা— বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যার কোনো রকম যোগসূত্র থাকবে না। আমরা হয়ে পড়বো এক বিচ্ছিন্ন দুনিয়ার বাসিন্দা।

যেদিন আমরা সেই নিভৃত প্রেমকুঞ্জটি খুঁজতে বেরোই, মন আমাদের ঝলমল করছিলো আনন্দে। যতোবারই কোনো বাড়ির সামনে দ'াড়িয়ে আমরা ডোরবেল টিপি, ততোবারই আমি ওর শরীর জড়িয়ে ধরি দু'বাহু মেলে। চুমু খেতে থাকি

বারংবার। তার পোশাক পরার ধরনটা যেন আঘাতের মতো। কোনো সময়েই তা উত্তেজিত করেনা। কোনো কোনো সময়ে এমন আকস্মিক ভাবে ভেতর থেকে দরজা খুলে যায় যে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি ওকে আমার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করার সময় পাইনা। কিংবা প্রগাঢ় চুম্বনের মাঝখানেই হয়তো দরজা খুলে বাড়ির লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। মুখ সাদা। চোখ কপালে। কখনো বা বিয়ের আংটি এমনকি ম্যারেজ-লাইসেন্স পর্যন্ত দেখাতে হয় বাড়িঅলাকে।

সন্ধ্যার দিকে আমরা হানা দিলাম এক উদার মনা দাক্ষিণী রমনীর বাস ভবনে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে' বার পর নাই খুশি হলাম আমরা দু'জনেই। মনে হলো, বাসাটা আমরা পেয়ে গেছি। তিনি যে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দেবেন, তা সত্যি দুর্দান্ত। কিন্তু দেখেই বোঝা যায়, আমাদের সাধ্যের বাইরে। মোনা কিন্তু বাসাটা নেবার ব্যাপারে এক রকম স্থির-সংকল্প। কারণ এরকম একটি বাড়িতে বসবাস করা তার অনেক দিনের স্বপ্ন। নতুন বাসার যে-ভাড়া আমরা মোটামুটি ভেবে রেখেছি, এ ফ্ল্যাটের ভাড়া তার দ্বিগুণ। কিন্তু এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই মোনার। আর আমি লোকটা তো আমিই। সব সমস্যা তাকে হস্তান্তর করে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার ভাবটা এরকম— মোনাই তো রয়েছে। সে-ই 'ম্যানেজ' করবে। সত্যি বলতে কি, বাসা আমারও খুব

পছন্দ হয়েছে। ঠিক ওর মতোই। কিন্তু ওই সব ম্যানেজ-ট্যানেজের ব্যাপারে আমার কোনোদিনই কোনো রকম মোহ নেই। আমি যা বুঝলাম, তা হলো, এই বাসাটা ভাড়া নিলে স্রেফ তলিয়ে যাবো

ভদ্রমহিলা অবশ্য আমাদের চেহারা সুরত দেখে কোনো রকম সন্দেহ করেন নি। আঁচও করতে পারেন নি আমাদের হাড়ির হাল-হকিকৎ আমরা কেতাদুরস্ত কায়দায় শেরির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলাম তাঁর উপর তলার ফ্ল্যাটে বসে। এক সময় ভদ্রমহিলার স্বামীও এসে গেলেন। তিনিও আমাদের দেখা-মাত্র ধরে নিলেন,— সুখী দম্পতি। ভদ্রলোক ভার্জিনিয়ার মানুষ। খাঁটি সজ্জন ব্যাক্তি। আমি কসমোলিক-সংস্থার চাকুরে শুনে দু'জনেই মুগ্ধ। এতো অল্প বয়সে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত আছি শুনে বিস্মিত হলেন তাঁরা। আমার সম্পর্কে বক্তৃতাটা অবশ্য মোনাই দিয়েছিলো। বাড়িয়ে বলার ব্যাপারে তার দক্ষতায় আমি শিহরিত। তার বক্তব্য অনুযায়ী, সুপারিনটেনডেন্ট পদে প্রমোশন পেতে আমার আর বিশেষ দেরী নেই। আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে কে আটকায় আমাকে!— 'মিস্টার টুইলিগার ই তো সেদিন কথাটা বললেন তোমাকে!' মোনা আমার দিকে না-তাকিয়েই বলে উঠলো। তাকালেও অবশ্য আমার মুখ দেখে সে কিছু আঁচ করতে পারতো কিনা, সন্দেহ।

তা, শেষ অব্দি ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, বাড়িটার ভাড়া হিসেবে দশ ডলার অগ্রিমও দিয়ে দিলাম আমরা। যে বাড়ির মাসিক ভাড়া নব্বুই ডলার, তার আগাম টাকার অঙ্কের নমুনা কিঞ্চিৎ কৌতূহলোদ্দীপক বইকি! আমার মাথায় ঢুকল না, বাকি আশি ডলার ভাড়া কীভাবে শোধ করা হবে। তাছাড়া কিছু আবশ্যকীয় জিনিসপত্র এবং আসবাবের ব্যাপার তো আছেই। সেগুলো কেনার টাকা আসবে কোত্থেকে? বুঝতে পারলাম না, কীভাবে কি হবে! উপরন্তু আমার মনে হলো, আগামের নামে জলজ্যান্ত দশটা ডলারই গচ্চা গেলো। আসলেও তাই। নেহায়েৎ মুখ রক্ষার খাতিরেই আমরা অগ্রিম দিলাম। আর কিছু না। ভাবলাম, মোনার মত বদলাবে শিগগীরই। ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়েই যে দশটা ডলার পানিতে ফেলা হলো, সে সত্যটা উপলব্ধি করতে ওর দেরী হবেনা।

কিন্তু আমি যে ভুল ভেবেছিলাম, তার প্রমাণ পেলাম অতি দ্রুত। নতুন বাসায় মোনা উঠবেই। এব্যাপারে কোনো রকম দ্বিমত পোষণের সুযোগই সে আমাকে দিলো না। আশি ডলার যোগাড় হলো মোনার এক অন্ধ ভক্তের সঞ্চয় থেকে ভক্তটি 'ব্রজটেলে' চাকরি করে রুম ক্লার্কের। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লোকটা কে?' জবাবে মোনা যে নামটি বললো, সেরকম কোনো নাম আমি জীবনেও শুনিনি। 'তোমার মনে নেই?' মোনা দু'চোখ কপালে তুলে বললো,

'মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই তো ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম তোমাকে। ওই যে, যেদিন কিফ্‌থ এভিন্যুতে উলরিক আর তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এ লোকটা একেবারেই ক্ষতিকর নয়।'

এধরনের সব মানুষই মোনার ভাষায়—'একেবারেই ক্ষতিকর নয়।' এভাবে পরিচিতি দেবার মাধ্যমে সে এটাই হয়তো আমাকে বোঝাতে চায় যে, এরা কখনো তাকে তাদের সঙ্গে রাত কাটাবার প্রস্তাব দিয়ে বিব্রত করবে না। তারা প্রত্যেকেই ভদ্রলোক। এবং ফিটফাট ছিমছাম তো বটেই। আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম ওই লোকটার চেহারা। বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যে মুখটা আমার মনের চোখে ভেসে উঠলো, তা এক কম বয়েসী যুবকের। এক কথায় 'ছোকরা' বললেই যার পরিচিতি স্পষ্ট হয়। একেবারেই নাবালক। এবং বিশেষত্বহীন। এরকম চেহারার বর্ণনা দেওয়া যায়না। এদের সঙ্গে মোনার বন্ধুত্ব আমার কাছে মনে হতো খুবই রহস্যময়। এই সব অন্ধ ভক্ত এবং ক্ষতিহীন বন্ধুবান্ধব সে কীভাবে জোটায়, আমি অনেক ভেবেও তার মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। অবশ্য এব্যাপারে খানিকটা অনুমান যে তার নেই, তেমন নয়। খুব সম্ভব গোড়ার দিকে মোনা আমাকে যে গল্প শোনাতো—এদেরও তাই বলে। এবং সবাই গল্পটা সর্বান্তকরণে বিশ্বাসও করে। গল্পটা হচ্ছে—সে বাবা মার সঙ্গে বসবাস করে। মা'টা ডাইনি। বাবা দিনরাত শুয়ে আছে বিছানায়। কী হয়েছে

তার ? ক্যালার !

সৌভাগ্যের ব্যাপার, মোনার ওইসব সহৃদয় বন্ধুবান্ধবদের বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। (মনকে, অতো কৌতূহল থাকতে নেই—আমি সব সময় একথাটা নিজেকে বোঝাই)। একটা কথাই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় বারবার। 'ক্ষতিহীন বন্ধুবান্ধব!' শব্দ বন্ধটি এক ধরনের গুরুত্ব বহন করে আনে আমার জন্যে।

নতুন বাসায় উঠতে চাইলে ভাড়ার টাকা ছাড়াও কিছু বাড়তি টাকা লাগে যে কোনো লোকের। আমি জানতে পারলাম, মোনা আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে। ওই গরিব ছোকড়ার ট্যাক থেকে সে তিনশো ডলার খসিয়েছে সে পাঁচশো ডলারই চেয়েছিলো। কিন্তু ছোড়ার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট খা খা করছে শূন্যতায়। ছেলেটি এই তথ্যই দিয়েছিলো মোনাকে। ফলে আরো বেশী গচ্চা গেছে তার। নগদ টাকার বদলে মোনা তার কাছ থেকে 'আদায়' করেছে ঝকঝকে একসেট পোশাক আর দামী এক জোড়া জুতো। সমুচিত শিক্ষা হয়তো একেই বলে।

বিকেলে রিহার্সাল দিতে গেলো মোনা। আমি বেরুলাম টুকিটাকি ক'টা জিনিস কেনার জন্যে। সেই সঙ্গে ফার্নিচারও পছন্দ করে আসা যাবে—ভাবলাম আমি। কিস্তিতে জিনিস-পত্রের দাম শোধ করার ব্যাপারে আমাদের দেশে যে নিয়মটি চালু হয়েছে, তা আমার কাছে স্রেফ বোকামো বলেই মনে

হয়। তা ওই কিস্তির কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ ডলোরেসের কথা মনে পড়ে গেলো আমার। ফুলটন স্ট্রীটে মস্তবড়ো এক ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে কাজ করে মেয়েটি। এব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম, ডলোরেস আমাকে বিমুখ করবে না। আমাদের সদ্য ভাড়া নেয়া শৌখিন ঘুঘুর বাসার সাজসজ্জার জন্যে যা যা দরকার, তা পছন্দ করতে আধ ঘণ্টা লাগলো আমার নিজের রুচিবোধের ওপর বিশ্বাস আছে আমার যথেষ্ট ফলে একটা সুদৃশ্য লেখার টেবিল পছন্দ করতে মোটেই দেরী হলো না আমার। চমৎকার টেবিল। অনেকগুলো ড্রয়ার তার। আমাদের আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে অবগত আছে ডলোরেস। তাই, কিস্তির টাকা কীভাবে মাসে মাসে শোধ করবো, সে ব্যাপারে সপ্রশ্ন মনে হলো তাকে। কিন্তু তাকে অভয় দিয়ে নিশ্চিন্ত করলাম আমি। বললাম, 'মোনা আজকাল নাটক থেকে ভালো আয় করছে। তাছাড়া কসমোকক্কিক-বেশ্যাবাড়ির চাকরিটা তো করছিই আমি।'

'বুঝলাম, কিন্তু সংসার চালাবার একটা খরচ আছে তো তোমার?'

'ও—এই কথা! তা, বেশি দিন তো আর ওর ভরন পোষন করতে হবেনা আমাকে।' আমি-ওকে আশ্বস্ত করি।

'তার মানে, মতলবটা তোমার সুবিধের নয়। কেটে পড়ার তালে আছো বুঝি?'

'অনেকটা ওই রকমই।' আমি মাথা ঝাঁকাই, 'আমরা তো

চিরদিনের জন্যে একটা মাইলস্টোন ঝুলিয়ে রাখতে পারিনা গলায়।'

আমার বিচিত্র স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জানা আছে ডলোরেসের। আমাকে আদর করে বেজন্মা বলে সে এখনও। বেজন্মাদের প্রশংসাই সে বেশি করে অন্যদের তুলনায়। চলে আসবার সময় সে বললো, 'কিস্তির টাকার ব্যাপারে তোমাদের বিশ্বাস করি কীভাবে?'

'বেশ তো। টাকা ঠিক মতো না শুধলে এরা সব আসবাবপত্র ফেরৎ নিয়ে আসবে ফ্ল্যাট থেকে।' আমি বললাম।

'দোকানের কথা আমি ভাবছি না।' ডলোরেস বললো, 'আমি ভাবছি আমার দোকানের কথা।'

'তাই বলো, তাই বলো।' আমি বললাম, 'তোমাকে আমি ডোবাবো, এরকম কথা ভাবতে পারলে? তাও কি সম্ভব?'

অবশ্যই মেয়েটাকে ডোবালাম আমি। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে

গোছগাছ করে নতুন বাসায় থিতু হলাম আমরা দু'জন বাড়ির আগের মালিক সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়েছেন এই বাসভবনটি। সেই সাবেক জজের রুচির তারিফ না করে থাকা যায়না সত্যি। টাকা পয়সারও ছড়াছড়ি ছিলো মনে হয় ভদ্রলোকের। কাঠের মেঝে তকতক করছে সব সময়। দেয়ালগুলোও কাঠের প্যানেল দেয়া। তাতে গোলাপী

সিল্কের ট্যাপেস্ট্রি টাঙানো। আমরা বাড়িটার এমন এক অংশে উঠেছি, যেখান থেকে নাগরিক নিসর্গের এক সুসমৃদ্ধ রূপ চোখে পড়ে। ব্রুকলীনের সবচাইতে অভিজাত এলাকায় এসে উঠেছি আমরা। এ ফ্ল্যাটে যারা থাকে, তাদের প্রায় সবারই আছে লিমুজিন গাড়ি রয়েছে বাটলার। তাদের মূল্যবান বিড়াল এবং কুকুরগুলো যা খায়, তাতে আমাদের পুরো মাস চলে যাবে হেসে খেলে। এলাকায় আমাদেরটাই একমাত্র ফ্ল্যাট, যেটা আভিজাত্যের বিচ্ছিন্নতা ঝেড়ে ফেলে রূপান্তরিত হয়েছে সাদামাটা অ্যাপার্টমেন্ট-বিল্ডিংয়ে।

মোনা অভিনয় করতে যায়। আমি যাই অফিসে। অবসরে বাড়ির পাশের লাইব্রেরীতে যাই পড়াশোনা করতে। লেখার টেবিলে বসার জন্যে হাতটা কেমন নিসপিস করে আমার। আমরা কারো সঙ্গে দেখা করিনা। ফোন করলে এড়িয়ে যাই। ভালো খাই দাই। যখন খুশি উলঙ্গ হয়ে বসে বসে গল্প করি অথবা শুয়ে থাকি পাশাপাশি। যতোবার মনে চায় লিপ্ত হই রতিক্রিয়ায়। আনন্দে বুঁদ হয়েই আছি বলা যায়। বলতে গেলে মোনার আশ্রয়েই কেটে যাচ্ছে আমার দিনরাত্রিগুলো। আমার যা কিছু আছে, সব মোনারই দেওয়া। সে সিল্কের যে বাথরোবটা আমাকে কিনে দিয়েছে, তা সাধারনত পরে থাকে সিনেমার নায়কেরা। মরক্কোয়ান এই স্যাণ্ডেল কেনার সাধ্য হতো কি আমার? সে যে দামী সিগারেট-হোল্ডারটা কিনে দিয়েছে আমাকে, তা ওর

সামনেই কেবল ব্যবহার করি আমি। ওই হোল্ডার থেকে যতোবার অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ি—ততোবারই এর প্রশংসা না-করে পারিনা। এর সবকিছুই মোনার কেনা। সবই সুন্দর এবং মূল্যবান।

কিন্তু সামান্য একটা এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজার হিসেবে আমার ভূমিকা মোনা আদপেই পছন্দ করে না। বলে, 'চাকরিটা ছেড়েই দাও। তার চেয়ে ঘরে বসে লিখবে।' বলা বাহুল্য তার এই মনোভাব গোপনে খুশি করে আমাকে। মুখে অবশ্য বলি, 'তা, বেশ তো, লিখবো আমার টেবিলে বসে আপন মনে। কিন্তু সুন্দরী, লিখে কি সংসার চলবে। নাকি তাতে জীবন রক্ষা করা যাবে।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু লোক-ঠকানো ব্যবসা করে কদ্দিন চালানো যাবে?'

'লোক-ঠকানো? কি বলছো এসব? যাদের কাছ থেকে আমি ধার নিই, তাদের অঢেল আছে। জানো, আমাকে ধারকর্জ দিতে পেরে ধন্য ওরা সবাই।'

তার সঙ্গে আমার দৃষ্টি ভঙ্গীর পার্থক্য আছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে হয় আমাকে। কি করবো, আমার তো সমাধান দেবার সামর্থ নেই। ফলে আত্মসমর্পনও নিত্য-নৈমিত্তিক।

ছুটির দিনে প্রায়ই সেকেণ্ড এভিন্যুতে বেড়াতে যাই মোনা আর আমি। কতো বন্ধুই যে ছিলো আমার এ তল্লাটে। সবাই ইহুদী জাতি অবশ্য। আর তাদের বেশির ভাগই পাগল।

কিন্তু কি আনন্দময় সেই বন্ধুসঙ্গ ? কল্পনা করা যায়না। পাপা মস্কোয়িটা থেকে কাকে রয়্যালে যাই আমরা। এখানে এলে যে কোনো লোকই খুঁজে পাবেন আপনি।

একদিন সন্ধ্যায় ওই রাস্তায়ই বেড়াচ্ছিলাম আমরা দু'জন। আমি একটা বইয়ের দোকানের শো-উইণ্ডের দিকে তাকালাম অভ্যাসবশত। তাকালাম, সেখানে ঝুলিয়ে রাখা দস্তয়েফস্কির ছবিটির দিকে। একই জানালায় একই ছবি কতো বছর ধরে যে ঝোলানো আছে, তার হিসেব নেই। ছবিটার দিকে তাকিয়েছি—হঠাৎ নাহুম য়ুদের গলা। নাহুম য়ুদ—মানে আর্থার রেমণ্ডের সেই বন্ধুটি। অদ্ভুত চেহারা। একবার দেখলে ভোলা যায় না। ইহুদিশ লেখে লোকটা। কথা বলে হড় বড় করে। কতো লোকের কতো রকম পরিবর্তন দেখলাম। কিন্তু ওকে আমি সব সময় দেখে আসছি এক রকম। প্রতি বারই দেখা যায়, সে অভিনব কিছু আবিষ্কার করেছে। খুঁজে পেয়েছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক কোনো বিষয় কিংবা বস্তু। আমার বগলের নিচ থেকে হ্যাঁচকা টানে বইখানা বের করে নিল নাহুম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী পড়ছো তুমি ? ও, হামসুন ? বাঃ, চমৎকার। খুব ভালো লেখক।' কতো-দিন পর দেখা। অথচ একবারও জিজ্ঞেস করলো না, আছি কেমন। 'চলো চলো, কোথাও গিয়ে একটু খানি বসা যাক। কথা আছে তোমার সঙ্গে। তা এদিকে যাচ্ছিলে কোথায় ? খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমার ? আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'

মাফ করতে হবে ভাই,' আমি বললাম, 'দস্তয়েফস্কীর একখানা বই আমার খুব দরকার।' আমি দোকানের শো-উইণ্ডের ভেতরে রাখা দস্তয়েফস্কীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম তাঁর বহুবার দেখা মুখখানা। নাহুম তখন মোনার সঙ্গে কথা কইছে খুব উত্তেজিত ভাবে। কথা বলার সময় কেবল মুখ নয়, সমানতালে নড়ে ওর দুটি হাত, এমনকি দুটি পা-ও। দস্তয়েফস্কীর ছবির সামনে বহুবারের মতোই আর একবার দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো, বন্ধু লুয়ো জাকবসের কথা। শেকস্‌পীয়রের একটি স্ট্যাচুর কাছ দিয়ে যাতায়াত করার সময় প্রতিবারই সে মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে সম্মান জানাতো। কিন্তু দস্তয়েফস্কীর প্রতি আমার যে অভিব্যক্তি, তাকে ঠিক সালাম কিংবা অভিবাদন বলা যাবে না। এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। বরং প্রার্থনার মতো কিছু বললেই যেন সঠিক বলা হয়। কী সহজ, কী সাধারণ, কী অন্তরঙ্গ একটা মুখ। হাজার মুখের ভীড়ে যে মুখ সহজেই মিশে থাকতে পারে। এমনকি নাহুম য়ুদ নামের ইদ্দিশ ভাষার এই লেখককেও যেন অনেক বেশি লিখিয়ে লিখিয়ে মনে হয় দস্তয়েফস্কীর চেয়ে। এই মহান শিল্পীর বিচিত্র চরিত্রের কয়েকটিকে নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ নাহুমের ভারী হাত দুটোকে অনুভব করলাম আমি আমার কাঁধের ওপর। তার চোখ দুটি যেন নৃত্য করছিলো।

'মিস্টিরিয়াম, মিস্টিরিয়াম, মিস্টিরিয়াম!' চেঁচিয়ে উঠলো নাহুম য়ুদ।

আমি শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

'বইটা তুমি পড়োনি?' সে জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

'কী বলছো তুমি? কী বই? কার লেখা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি বলছি তোমাদের ন্যুট হামসুনের কথা। জার্মান ভাষায় লেখা ওই মিস্টিরিয়ামই হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ বই।'

'তার মানে মিস্ট্রিজ—অর্থাৎ রহস্য পুঞ্জ।' বললো এবার মোনা।

'ঠিক ধরেছেন, রহস্য—' চীৎকার করে ওঠে নাহুম য়ুদ। 'শব্দটা কি শ্রুতিমধুর, তাই না?' মোনা বললো।

'তাঁর 'এ ওয়াণ্ডারার প্লেজ অন মিউটেড স্ট্রিংগ্স'-এর চাইতেও বেশী।' একেবারে লাফিয়ে উঠলো নাহুম য়ুদ। 'এমনকি তাঁরই নোবেল প্রাইজ পাওয়া বই গ্রোথ অফ দ্য সয়েলের চাইতেও। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, এই মিস্টিরিয়ামের নামও অনেকে শোনেনি। যাই হোক--অতো কথার দরকার নেই। আপনি সোজা চলে যান আপনাদের ওই কার্ণেগি চ্যাংপাম লাইব্রেরীতে। তারপর বইটা চান। ইংরেজিতে এ বইয়ের নাম কীভাবে বলতে হবে, ভাবছেন? মিস্ট্রিজ? শুনতে প্রায় একই রকম, তাইনা? কিন্তু মিস্টিরিয়াম শব্দটির মাধুর্যই আলাদা।' অট্টহাসি হেসে উঠল সে

অকারণে। হাসির চোটে টুপির কানাৎ এসে পড়লো তার চোখের ওপর।

হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো, তার বক্তৃতার চোটে বেশ কিছু লোক জমে গেছে তাকে ঘিরে।

'বাড়ি যান!' চেঁচিয়ে উঠলো নাহুম য়ুদ। দু'হাত শূন্যে তুলে তাড়িয়ে দেবার ভঙ্গী করে সে বললো, 'আমরা কি এখানে জুতোর ফিতে বিক্রী করছি নাকি? যা—ন!' সে আবার ভঙ্গী করলো মাছি তাড়াবার। 'নিজের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলবার সময়েও কি হল ভাড়া নিতে হবে নাকি? এটা রাশিয়া নয়। যান--যার যার বাড়ির দিকে হাঁটুন সবাই।' আবার খেদিয়ে দেবার ঢঙে হাত নাড়াতে লাগলো নাহুম য়ুদ। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার তাড়া তাদের নেই মনে হচ্ছে। তারা বরং মিট মিট করে হাসতে লাগলো নাহুমের দিকে তাকিয়ে। আসলে নাহুম তাদের পরিচিত। কেবল পরিচিত নয়, প্রিয়-পাত্রও একজন। 'এই হচ্ছে নাহুম য়ুদ।' জটলার ভেতর থেকে ইদ্দিশ ভাষায় কে যেন বলে উঠলো। এক ধরনের বেদনা মিশ্রিত হাসি হেসে আমাদের দিকে তাকালো নাহুম। সে হাসিতে প্রশ্রয় যেমন রয়েছে, তেমনি আছে অসহায়তাও।

'ওরা চাইছে, ইদ্দিশে কিছু আবৃত্তি করি আমি ওদের জন্যে।' বললো সে।

'বেশ তো, খুব ভালো কথা।' আমি বললাম, 'তা শোনা-চ্ছোনা কেন তুমি?'

সে আবার হাসলো, বললো, 'বুঝলে, এরা একেবারে শিশুদের মতো। আচ্ছা, বোসো, আমি ওদের শোলক শোনাবো। শোলক কি, তা জানো তো? জানো না! এই গল্পটা সবুজ ঘোড়ার--যে ঘোড়াটির তিন পা ছিলো। কিন্তু শোলকটা কেবলমাত্র ইদ্দিশ ভাষাতেই বলতে পারবো আমি।...তোমরা আমার অপরাধ নিয়ো না।'

যেইমাত্র সে ইদ্দিশে বলা শুরু করলো, সে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। চোখমুখ তার এমন করুণ হয়ে এলো আমরা ঘাষ্‌ড়ে গিয়ে ভাবলাম, লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে না ওঠে। কিন্তু তার শ্রোতাদের দিকে যখন আমার চোখ পড়ল, আমি অবাক হলাম। সবার মুখেই এক ধরনের আনন্দাভা। কেউ কেউ মুখ টিপে হাসছেও। নাহুমের অভিব্যক্তি যতোই করুণ হচ্ছে ওদের হাসিখুসি ততোই হচ্ছে বিস্তৃত। শেষ দিকে সবাই সমস্বরে হেসে উঠলো রাস্তা কাঁপিয়ে। কিন্তু নাহুম তার মুখখানাকে গোমড়া করেই রেখেছে। দুঃখী দুঃখী মুখ করে সে শ্রোতাদের দিকে তাকালো একবার।

'এখন' নাহুম বলে উঠলো, 'আমরা যাবো গান বাজনা শুনতে।' কথাটা সে ওদের দিক থেকে ঘুরে, আমাদের দু'জনের কাঁধে দু'হাত রেখে বললো। হেষ্টার ষ্ট্রীটে একটা সেলার চিনি আমি। সেখানে নাচে রুমানীয় জিপ্‌সী মেয়েরা। সেখানে বসে নাচ দেখতে দেখতে দু'এক চুমুক ওয়াইন নেহাৎ মন্দ লাগবে না। তাছাড়া, কিছু মিষ্টিরিয়াম...কি বলো?

তা, টাকা পয়সা আছে তো সঙ্গে ? আমার পকেটে মাত্র তেইশ সেন্ট আছে।' নাহুম হাসলো।

হাঁটতে হাঁটতে সে বারবার টুপি খুলে নাড়ছিলো--নানা রকম লোক সামনে পড়তেই। প্রায়ই সে কারো না কারো সামনে দু'এক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দু'একটা কথাবার্তা সেরে নিচ্ছিলো। 'কিছু মনে কোরোনা' এক সময় সে বললো, 'ভেবে ছিলাম ক'টা টাকা ধার নেবো। ওই যে, ঐ লোকটাকে দেখলে না ? একটা ইদ্দিশ কাগজের সম্পাদক। ব্যাটা আমার চেয়েও ফকির হয়ে আছে আজ। তা, তোমার কাছে কি সামান্য কিছু টাকা হবে ? হবে বোধহয় ! এর পরেই আমি খরচ করবো একদিন।'

রুমানীয়দের সেলারে ঢুকেই পেয়ে গেলাম আমার অফিসের এক সাবেক কর্মচারিকে। দেভ অলিনস্কি। আমাদের অফিসের গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রীট শাখায় সে ছিলো নাইট ম্যাসেঞ্জারদের একজন। ওর কথা আমার এখনো মনে আছে এজন্যে যে একবার চোর সন্দেহে ওকে অফিসে পিটিয়ে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিলো। আমি তো ভেবেছিলাম, ও মরেই গেছে। বস্তুতঃ আমার অনুগ্রহেই সে ওই শাখাতে বদলি হয়। অবশ্য এজন্যে সে অনুরোধও করেছিলো আমাকে। অনুরোধের কারণ, শাখায় বিদেশীদের আনাগোণা আদান প্রদান বেশি। আর অলিনস্কি ভাষাও জানে মোট আটটা। ভেবেছিলো, বেতনের পরও ভালো বখশিস জুটবে তার ওখানে।

কাউকেই দেখতে পারতো না লোকটা। এমন কি যাদের সঙ্গে কাজ করতো, তাদেরও। আমি যতোবার তার সামনে পড়েছি, সে আমার কান পচিয়ে ফেলেছে তেল আভিভ, তেল আভিভ করে।

আমাদের অফিসের চাকরিটা ছেড়ে দেবার পর সে নাকি কোন্ ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে কাজ নেয়। এবং আমিও তাকে উৎসাহিত করার জন্যে একটা পলিসি করাতে রাজি হই। যাই হোক, আমাকে দেখে দারুণ খুশি হয়েছে অলিনস্কি। আমাদের জন্যে ড্রিংকস আর প্যাস্ট্রির অর্ডার দিলো সে। তার মুখে বীমা ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ নেই।

'আপনার পলিসির কী হলো মিষ্টার মিলার?' জিজ্ঞেস করলো অলিনস্কি।

'বলেছিলাম তো--করাবো। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার যে দু'দুটো পলিসি রয়েছে।' আমি নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বললাম।

'তাতে কি হয়েছে?' অলিনস্কি বললো, 'তাতে কোনো অসুবিধে হবেনা। আমরা ওদের নগদ টাকা দেবো।'

'ওই নিয়েই আমি চিন্তা করছি এখন।' আমি মোকাবিলা করার চেষ্টা করি।

'এনিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।' বলল অলিনস্কি।

'ব্যাপারটা আমি খুব পরিস্কারভাবে বুঝতে পারিনি। মানে পুরো জিনিসটা আর কি!' আমি বললাম, 'তুমি বরং আমার

বাসায় এসো কাল রাত্রেই।' বলতে বলতে একটা মিথ্যা ঠিকানা দিলাম আমি ওকে।

'আপনি তো সে সময় বাড়িতেই থাকবেন মিস্টার মিলার?'

'আমি যদি না-ই থাকি, টেলিফোনে বলে দেবো আগেই। অথবা যেখানেই থাকি, সেখান থেকেই কথা বলাবো ফোনে।'

'কিন্তু আমার তো টেলিফোন নেই মিস্টার মিলার?'

'তাহলে টেলিগ্রাম করে দেবো একটা।'

'কিন্তু কাল রাত্রে আমার আরো দু'টো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যে।'

'তাহলে আমরা পরের দিন সন্ধ্যায় বসতে পারি।' বললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি, 'অথবা। তুমি শেষ রাত্রের দিকেও চলে আসতে পারো আমার বাসায়। আমরা রাত দু'টো তিনটে পর্যন্ত জেগেই থাকি।'

'আমার মনে হয়, সেটা অনেক রাত হয়ে যাবে।' চিন্তিত মুখে বললো অলিনস্কি।

'তাহলে এক কাজ করা যাক বরং।' আমি বুদ্ধি বাতলাই, 'এক সপ্তাহ পর, আমরা এই সেলারে বসেই কথাবার্তা সারতে পারি। ধরো, ঠিক সাড়ে ন'টায় ক'টায় কাঁটায় কাঁটায়?'

'এখানে না, প্লিজ মিস্টার মিলার।'

'ঠিক আছে। তোমার যেখানে খুশি, সেখানেই বসা যাবে।' বললাম আমি। 'একটা পোস্টকার্ড লিখে পাঠিয়ে দিও আমার নামে। আর সঙ্গে করে এনো তোমার ওইসব পলিসি

টলিসিগুলোও।'

কথা শেষ হলে অলিনস্কি উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। তারপর আমার সঙ্গে করমর্দন করে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজ পত্রগুলো জড়ো করতে লাগলো। হঠাৎ চমকে উঠলো সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিস্কার করে। একটি কাগজে জীব জন্তুর ছবি আঁকছে ম্যানি হিরশ্চ। আর একটাতে ইদ্দিশ ভাষায় কবিতা লিখছে নাহুম য়ুদ। ঘটনার এই অবিশ্বাস্য দিক্ পরিবর্তনে অলিনস্কি এমন ভয়াবহ রকমে বিরক্ত হলো যে, বিভিন্ন ভাষায় চীৎকার করে সে দু'জনকে তিরস্কার করতে লাগলো। রাগে সে যেন পাগল হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বাউন্সারের অবির্ভাব। লোকটা গ্রীক। আগে ছিলো মুষ্টি-যোদ্ধা। সে অলিনস্কিকে প্রায় শূন্য করে নিয়ে দরজার কাছে ফেললো। তারপর তার পকেট হাতড়ে টাকাকড়ি যা পেলো, বের করে এনে সেলারের সত্ত্বাধিকারিনীর সামনে রাখলো। মহিলা তার বিল বুঝে নিয়ে বাকি পয়সা ফেরৎ দিয়ে দিলেন বাউন্সারের কাছে। বাউন্সার আবার তা নিয়ে তুলে দিলো অলিনস্কির হাতে। বেচারা তখন মেঝের ওপর একরকম হামাগুড়ি দিয়েই বসে আছে। যেন হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে তার।

'মানুষের সঙ্গে এমন ভয়ঙ্কর আচরনের কথা ভাবা যায়না।' বললো মোনা।

'তা ঠিক।' আমি বললাম, 'কিন্তু এজন্যে তো ও নিজেই

দায়ী। ও নিজেই এই অপমান আর লাঞ্ছনাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে।'

'তাই বলে কারো সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে হবে?'

'অস্বীকার করছি না তোমার কথা। কিন্তু মানুষটাও বিরক্তিকর। আর ঘটনাটিও ঘটতে পারতো যে কোনো জায়গায়।' আমি বললাম। ওর অতীত কীর্তিকলাপের কিছু কিছু টুকরো অংশ নিচু গলায় তুলে ধরলাম মোনার সামনে। 'ওকে অনেক আগেই আমি ভালো হয়ে যাবার উপদেশ দিয়েছিলাম।' বললাম আমি, 'কিন্তু কে শোনে কার কথা। চুরির অপবাদে আমার অফিসে মার ধোর খেয়ে সে এমনি করেই পড়ে ছিলো মেঝের ওপর। আমি চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ওকে বলেছিলাম, দ্যাখো দেভ, তুমি হয়তো জানোনা, আমি তোমাকে আপন ভাবি। তোমাকে নতুন ব্রাঞ্চে বদলি করে দিচ্ছি বলে হতাশ হবার কিছু নেই। বরং এজন্যে ভবিষ্যতে আমাকে তুমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবে। এখন, নিজের মঙ্গল যদি চাও এই কথাগুলো মনে রাখতে চেষ্টা কোরো। সবার আগে যা করতে হবে, তা হলো, মুখটা বন্ধ রাখবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনো কখনো একটুখানি হেসো। বখশিস না-দিলেও একবার ধন্যবাদ জানালে কোনো ক্ষতি নেই। আর হ্যাঁ, একটা ভাষার কথা বলবে। অন্য ভাষায় পারত পক্ষে নয়। কবে তুমি একজন ম্যানেজার হবে, সে চিন্তা শিকেয় তুলে রাখো। বরং একজন ভালো মেসেঞ্জার হবার চেষ্টা করো। আর একটা

কথা। সব সময় অতো তেল আভিভ, তেল আভিভ কোরোনা। লোককে বারবার বলার দরকার নেই, তুমি তেল আভিভ থেকে এসেছো। কারণ তুমি কী ছাইপাশ বলছো, তা কেউ বোঝেনা। তোমার জন্ম ব্রনস্কে, বুঝতে পারছো? মাঝে মাঝে সিনেমায় গিয়ে হাসির ছবি টবি দেখো। মুখখানাকে অমন হাঁড়ির মতো করে রাখলে চলবে না।'— তা, আমি বললাম, 'এতোদিনে ভাগ্য ফেরাতে পারলেও ওর স্বভাবের খুব একটা রদবদল হয়নি।' অনেক রাতে সেলার থেকে বের হয়ে এলাম আময়া।

নাহুম য়ুদের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করার সময় কতো কথা মনের মধ্যে ভীড় করে আসে। এই ইস্ট সাইডে কতো বন্ধু-বান্ধবই না ছিলো আমায়। মনে আসে ও রুরকির কথা। এখানে এলেই মনের মধ্যে বাড়ি ফেরার অনুভূতি জাগে যেন। যেন রেম ব্রান্টের আঁকা ছবি। সেই দরিদ্র পল্লীটি অবশ্য অদৃশ্য হয়েছে এখন। চারদিকে ঝলমলে দোকান স্পষ্ট। আকাশ-আঁচ্ড়া দালান কোঠা। ঝাপসা, বিবর্ণ, ছোট ছোট বাড়ির জানালার পাশে কেরোসিন-ল্যাম্প্ জ্বালিয়ে পড়তে বসা দুঃখী ছেলে মেয়েদের হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না আর। আমার শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে সেই কালি পড়া হ্যারি-কেনগুলোও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে ইস্ট সাইড থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বিদায় নিলো নাহুম। আমি আর মোনা ফিরে এলাম আমাদের ঘুঘুর বাসায়। অলনস্কির কথা

মনে হতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক-খানাকে কাঁপিয়ে দিয়ে। কাপড়-চোপড় ছাড়তে ছাড়তে ভাবলাম, সবাই আমাকে ইতিমধ্যে একজন লোক হিসেবে গণ্য করে নিয়েছে তাহলো, ব্যাপারটা যার পার নাই বিস্মিত করে আমাকে। আমি এমন কি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেছি যে সবাই আমার প্রতিভা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করবে মোনার মতো? আমি এ পর্যন্ত, খুবই বিক্ষিপ্তভাবে যা লিখেছি, তাতে আর কিছু না-থাক, ভাষার প্রতি এক ধরনের ভালোবাসার ছাপ আছে। অক্ষর পরিচয় হবার পর থেকেই আমি গ্রন্থকীট। দাদা যখন সেলাই কলের সামনে ঝুঁকে বসে কাজ করতেন, আমি উচ্চস্বরে বই পড়ে শোনাতাম তাকে। বুড়ো আমার ব্যাপারে গর্বিত ছিলেন খানিকটা। আবার এক ধরনের দুর্ভাব-নাও যেন ছিলো তাঁর, আমাকে নিয়ে। মাকে একদিন সাবধানও করে দিলেন, তোমার ছেলের অতো বই ঘাঁটাঘাঁটি আমার কাছে ভালো মনে লাগছে না। বিশেষ করে বুড়োদের যে সব বই আমি লুকিয়ে পড়তাম--দাদা তা টের পেয়ে গিয়ে-ছিলেন। আমি গাঁয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বই পড়ে শোনাতাম জোরে, টান প্রমুখ ছোট্ট বন্ধুদের। কখনো কখনো এক ডজন কিংবা তারো বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যিখানে বসে আমি চড়া গলায় পড়ে যেতাম পাতার পর পাতা। কখনো দেখা যেতো, আমি পড়েই চলেছি, আর আমার শ্রোতারা বইয়ের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে একে একে।

বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমার মনের ভেতরে লেখক হবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে একদিন। আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমার প্রথম উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা হবে এক শো।

২

নতুন বাসায় ওঠার পর কয়েক মাস চলে গেছে। এখানে আমাদের সময়টা কেটে যাচ্ছে বেশ ভালোভাবেই। সপ্তাহে একদিন আমি মদে আর বাচ্চাটাকে দেখতে যাই। তাদের খোরপোষের টাকা দিয়ে আসি। তারপর হয়তো পার্কে গিয়ে খানিকটা ঘোরাঘুরি করি। মোনা যথারীতি আছে তার নাটক নিয়ে। অভিনয় করে যা কামাচ্ছে তা থেকেই খরচা দিচ্ছে মাকে। আর মা তার দুই তাগড়া ছেলেকে নিয়ে খাওে পিওে গিলছে বসে বসে। দশ দিনে একদিন আমি ফ্রেঞ্চ ইতালিয়ান গ্রসারিতে খেয়ে নিই। একা একা। কেননা নাট্যশালায় খুব সকাল সকাল গিয়ে হাজির থাকতে হয় মোনাকে। মাঝে মাঝে চলে যাই আমি উলরিকের ওখানে। দাবা খেলি দু'জনে। আমাদের আড্ডার ইতি ঘটে প্রধানত চিত্র এবং চিত্রকর সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে। তাছাড়া বাকি সময়টা আমি বাসাতেই বসে বসে বই পড়ি অথবা

গ্রামোফোন বাজাই। মোনা ঘরে ফেরে প্রায় মধ্যরাত্রে। আমরা তখন সামান্য কিছু খেয়ে নিই। বসে গল্প সল্প করি। তারপর শুতে যাই। মোনার মতো অতোটা সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গে না আমার। ফলে ভোর বেলা যখন ও কর্মস্থলের দিকে রওয়া হয়ে যায়, আমি সুপ্রভাত বলে বিদায় জানাতে পারিনা ওকে। শৌখিন আর আয়েসী ধরনের জীবন যাপনের মৌতাতে আমি ঘন ঘন অফিস কামাই করছিলাম। একদিন লক্ষ্য করলাম, একনাগাড়ে তিন দিন যাইনি। এবার আর চাকরি থাকবে না। আসলে ওই খাঁচার মধ্যে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না আমার। প্রাপ্য পদোন্নতি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে বড়ো কর্তার উপর আমি খুশি নই এমনিতেই। মেজো কর্তা মিষ্টার টুইলিগার আমার কাজেকর্মে প্রীত। এবং ভালোবাসেন আমাকে খুব। কিন্তু স্পিভ্যাক যথারীতি লেগে আছে আমার পেছনে। তাকে বেশির ভাগ সময়ই এখন ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে ব্রুকলীন এলাকায়। নাহ্‌-- এভাবে চলে না। একটা ফয়সালা এবার হয়েই যাক।

চারদিনের দিন খুব সকালে আমি ঘুম থেকে উঠলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম না। মোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘুম থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ওকে জানাতে হবে। মোনা তো আমার মুখ থেকে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে লাফিয়ে উঠলো। সে এক্ষুণি অফিসে গিয়ে আমাকে পদত্যাগপত্রটি

তুলে দিতে বললো ওদের হাতে। তার কণ্ঠে কাতরতা। অনুনয়। বললো, 'চাকরিটা ছেড়ে দিয়েই তুমি বাসায় এসে লাঞ্চ খাবে।' আমি ভরসা পেলাম ওর দৃঢ়তায়।

অফিসে গিয়ে দেখি, সুইচ বোর্ডের সামনে বসে কাজ করতে করতে হাইম হাঁসফাস করছে। আমাকে দেখে যেন ভরসা পেলো।

'চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি।' বললাম আমি। 'রেজিগ্‌নেশন লেটারটা আমি তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি। ওটা তুমি ক্ল্যাণি অথবা স্পিভাককে পৌঁছে দেবে।'

সাদা হয়ে গেল হাইমের মুখ। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না। যেন বোবা হয়ে গেছে। তারপর কাটাকাটা ভাবে বললো, 'তোমার বেতন? বেতন নেবে না?'

'চাইনা বেতন। ওটা ওরাই রেখে দিক।' আমি বললাম।

'কী বললে?' চীৎকার করে উঠলো হাইম। ওর মুখ দেখেই আমার মনে হলো, ও ভেবেছে, নির্ঘাত আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

'বেতন চাইবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই এখন।' আমি বললাম, 'আমি বিনা নোটিশে চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছো না? তোমাকে এই জঘন্য জায়গায় ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে বলে খুব দুঃখ হচ্ছে আমার।। প্রচণ্ড ভীড় আর হৈ হল্লায় মুখর অফিসটার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমার মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হলো। গত

পাঁচটি বছর যাবৎ কীভাবে আমি চাকরি করলাম এই হৃদয়-হীন কর্পোরেশনে? সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দেবার সময় একজন সৈনিকের মনেও খুব সম্ভব এরকম অনুভূতি হয়।

মুক্তি। মুক্তি। মুক্তি।

উৎফুল্ল মন নিয়ে ব্রডওয়ের দিকে রওনা হলাম আমি। পেছনে জঘন্য সেই অফিস। যার ভেতরে বেঁচে থাকার প্রাণপণ সংগ্রামে মাথা কুটে মরছে আমার সহকর্মীরা। ইস—একবার যদি স্পিভাক আমার সামনে পড়তো এখন। শুধু একটিবার সে আমাকে অফিস ফাঁকি দিয়ে ঘুর ঘুর করার অপরাধে কৈফিয়ৎ তলব করতো?

চাকরী বাকরী ব্যাপারটাকে এখন যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি হাস্যকর মনে হচ্ছে। আমার মতো লোক পরের গোলামী কেন করবে? আমি প্রতিভাবান। আমার রয়েছে সৃষ্টি করার ক্ষমতা। আমাকে লেখক হতে হবে। যেভাবেই হোক। লেখক হবার সাধনায় নিমজ্জিত হয়ে যদি আমার মৃত্যু হয় তাও ভালো।

পথে একটা মিউজিক শপ থেকে বিঠোফেনের একটা রেকর্ড কিনলাম আমি। ফুল কিনে নিলাম একটা দোকান থেকে একগুচ্ছ। এক ইতালীয় বন্ধুর নিজস্ব ভাঁড়ার থেকে সংগ্রহ করলাম এক বোতল চিয়ান্তি। নতুন জীবন শুরু হবে একটা সুন্দর খানাপিনা দিয়ে।

গৌরবময় সেপ্টেম্বর মাস। পাতা ঝরার দিন। বাতাসে

ভাসছে মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। যে কেউ ইচ্ছে করলে সমুদ্র স্নানে যেতে পারে এখন। সবকিছু যেন একসঙ্গে করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। প্রথমেই একটা পিয়ানো যোগাড় করতে হবে আমাকে। শুরু করতে হবে সঙ্গীত চর্চা। তাছাড়া আমি বোধহয় ছবি আঁকাও আরম্ভ করতে পারবো আবার। রেসিং বাইক নিয়ে হাওয়ার বেগে উড়ে চলতে কতো ভালোবাসতাম আমি। মাত্র বছর দুয়েক আগেই বাইকটা এক আত্মীয়ের কছে বেচে দিয়েছি আমি। ওটা ফিরিয়ে আনতে পারলে, ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায়? টাকা দিলে কেন দেবে না সে ফিরিয়ে? যা বোকা ওই চাচাটা? অমন চমৎকার সীটটা পাল্টে ফেলেছে কিনা, কে জানে। আমি যা যা আমার মন চায় সবই পেতে পারি, যদি লেখক হতে সক্ষম হই। আর লেখক হতে পারবোই না বা কেন? না খেমে যদি তিরিশ পৃষ্ঠার একটা চাউস চিঠি লিখতে পারি, বই লিখতে পারবো না কোন্ যুক্তিতে? তাছাড়া সবাই এ ব্যাপারে আমার সম্ভাবনার কথা বলাবলি করছে সমস্বরে। তাদের ধারনাকে বাস্তবায়িত করবোই আমি। বাসায় ফিরতেই মোনা এসে দোর খুললো। তার পরনে কিমোনো। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি শুনে খুশিতে ঝলমল করে উঠলো ওর মুখ চোখ। জিনিসগুলো ওর হাতে তুলে দিলাম আমি। 'আজ থেকে শুরু হলো আমাদের নতুন জীবন।' আমি বলে উঠলাম, 'কী ভাবে জীবন যাপন করবো,

জানি না, তবে বাঁচার মতো বাঁচতে চাই আজ থেকে। টাইপ রাইটারটা ঠিকঠাক আছে তো? আমাদের লাঞ্চের কথা। উলরিককে একবার খবর দেবো কি? ও চলে আসুক। আমাদের সঙ্গে খাবে।' আমার সারাটা শরীর যেন ফেটে যাবে আনন্দের উচ্ছ্বাসে। 'তুমি আমার সামনে একটুখানি দাঁড়াও তো? তোমাকে আমি দেখি। ওইভাবে হাঁটোতো, একটু আগেই যে ভাবে পা ফেলেছিলে। আমি কেবল তাকিয়ে থাকবো তোমার দিকে, কিছুই করবো না।'

আমার বাক্য বন্ধের সামান্য বিরতিতে যেন আত্মস্থ হলো মোনা। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো সে।

'তোমার হয়তো সন্দেহ ছিলো, আমি পদত্যাগ করবো, কি করবো না। কিন্তু করলাম কেবল তোমার জন্যে। তোমার কথা রাখার জন্যে। ছাখো, অফিসে গিয়ে রোজ রোজ চাকরি করা সোজা। কঠিন যেটা তা হলো মুক্ত থাকা। আমি কতো কিছু করতে পারবো এখন। অথচ গত পাঁচটি বছর আমি ছিলাম স্থির, নিষ্ক্রিয়। সোজা কথায় একটা অকর্মার ধাড়ি।'

মোনা হাসছিলো। বললো, 'কতো কিছু করবে, তাই না? নিশ্চয় করবে। তুমি হচ্ছো পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। না, প্রিয় ভাল। তুমি কিছুই করবে না। আমি লেখা টেখার বিষয় তোমাকে, এমন কি, কোনো চিন্তা করতে বলবো না। আগে তোমার একটা দীর্ঘ বিশ্রামের দরকার।

তুমি বিন্দুমাত্র ভেবোনা। সংসার চালাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। আমি যদি আমার অলস মা আর ভাইগুলোকে খাওয়াতে-পরাতে পারি; তোমার আর আমার খরচ চালাতে পারবো না?'

নিজেকে সম্রাটের মতো ক্ষমতাশালী আর সুখী মনে হয়। যেন আমি সম্রাট সলোমন। এমনকি তার চেয়েও বড়ো। একটু আগে থিয়েটার দেখতে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে মোনা। আমার প্রিয় কৌতুকাভিনেতা রয় বার্ণেস রয়েছে সেই নাটকে। যাবো বৈকি! নিশ্চয় যাবো। এমন একটা দিন আজ! বারো ঘণ্টার প্রতিটি মিনিট উপভোগ করতে হবে তাড়িয়ে তাড়িয়ে। আজ উলরিককে নিয়েই খাওয়া দাওয়া করবো আমরা। এমন লাল-হরফ দিন ক'টা আসে মানুষের জীবনে। বাইক ফিরিয়ে আনা, পিয়ানো বাজানো কিম্বা ছবি আঁকা শুরু করার পরিকল্পনার কথা শুনে মোনা যা খুশি। সর্বান্তকরণে সমর্থন করলো সে প্রতিটি বিষয়কে। এমনকি পিয়ানো বাজানোটা নিজেও শিখবে বলে জানিয়ে রাখলো আপাম।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে আমি বললাম, 'তা, এই যে আজ থেকে আমরা একটা নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি, সেই নতুন জীবনের কাছে তোমার কী প্রত্যাশা!'

'সে প্রত্যাশার কথা তুমি নিশ্চয় জানো।' মোনা বললো।

'জানিনা তো!' আমি বললাম। 'কী সে প্রত্যাশা?'

জিজ্ঞেস করলাম আবার।

সে আমার সামনে এসে দাঁড়লো। কাঁধের ওপর আলতো-ভাবে রাখলো দু'টি হাত। বললো, 'তোমাকে নিয়ে আমার প্রত্যাশা এটাই যে তোমাকে লেখক হতে হবে। মস্তবড়ো লেখক।'

'এই বুঝি তোমার একমাত্র চাওয়া?'

'হ্যাঁ ভ্যাল। একমাত্র। বিশ্বাস করো আমাকে।'

'তোমার থিয়েটারের কি হবে? তুমি কি একদিন নামকরা অভিনেত্রী হতে চাও না?'

'না ভ্যাল। আমি জানি, আমি কোনদিন তা হতে পারবো না। অমন দুরাশাও নেই আমার। আমি অভিনয় করি এজন্যেই যে তুমি আমাকে থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত দেখতে ভালোবাসো।'

'অভিনয় সম্পর্কে এধরনের চিন্তা ভাবনা, তোমার প্রতিষ্ঠা লাভে কিন্তু সহায়তা করবে না।' আমি বললাম, 'নিজের কথাও নিশ্চয় ভাবতে হবে তোমাকে। তুমি যা সবথেকে ভালো-বাসো তাই করবে। আমি কি মনে করলাম, কী আমার ভালো বা মন্দ লাগে, তাতে কি আসে যায়? আমি তো জানি, নাটকের জন্যে তুমি পাগল।'

'আমি কেবল একটা জিনিসের জন্যেই পাগল, আর তা হচ্ছো তুমি।'

'তুমি এখন অভিনয় করছো,' আমি বললাম।

'মনে হয় তাই। তবে এটা সহজ হবে আরো।'

আমি ওর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলাম। 'আচ্ছা বেশ।' আমি টেনে টেনে বললাম, 'এখন তুমি আমাকে পুরোপুরিভাবে এবং চিরদিনের জন্যে পেয়েছো। দেখা যাক, আজ থেকে এক মাস পরে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়। হয়তো এই সময়টাতে সর্বক্ষণ আমাকে নিজের পাশে দেখে তোমার নাও বা ভালো লাগতে পারে। কে জানে, হয়তো বা অসুস্থ বোধও করতে পারো।'

'কখনো নয়।' মোনা বললো, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই আমি চেয়েছিলাম এটা। তোমাকে আমি হিংসা করি, তা কি তুমি জানো? আমি তোমার প্রতিটি নড়াচড়া দেখতে চাই।'

কথা বলতে বলতে সে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো আমার। নিজের মাথাটা আমার কপালের ওপর আলতো ভাবে রেখেছিলো সে সময়। 'আমি তোমার মনের লেখা পড়তে পারি।' বললো মোনা, 'যখন তুমি চুপ করে থাকো, আমি তখন বুঝতে পারি, তুমি অনেক দূরের কোনো কিছু নিয়ে ভাবছো। আমি তোমার লেখার ব্যাপারেও ঈর্ষা-পরায়ন। কেননা আমি জানি, লিখতে যখন বসবে, তখন আমার কথা মনেও থাকবে না তোমার।'

'আমাকে দেখছি এর মধ্যেই দাঁড় করিয়ে ফেললে কাঠ-গড়ায়।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'শোনো, তুমি কি করছো? দিনটা তো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এতো আয়ো-

জনের দরকারটা কি ছিলো তাহলে ; আজকের দিনটায় অন্ততঃ ভবিষ্যত ভাবনাটা তুলে রাখলে হতো না ? আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করবো আমরা। ইহুদি আচারের কথা বলেছিলে তুমি। সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছো তো ? আমি এখন গিয়ে নিয়ে আসিগে ভালো দেখে কিছু কালো রুটি, কিছু জলপাই আর পনির। আরো যা যা লাগে অনুষ্ঠানে। এসবের সঙ্গে কিছু ভালো খাবারেরও তো দরকার। আমি খুব ভালো একটা ওয়াইন কিনে এনেছি। এবার কিছু প্যাস্ট্রি আনা যেতে পারে। খানিকটা আপেল-স্ত্রাদেল। ও, ভালো কথা, তোমার কাছে কিছু টাকা আছে ? আমার কাছে যা ছিলো শেষ। বাঃ, কতো দিচ্ছো ? পাঁচ ডলার। আর ক'টা ডলার বেশি দেয়া যায়না ? কাল আমি দেখবো। ঠিক আছে ? তুমি স্পঞ্জিকুসের কথা বলেছিলে। কোত্থেকে আর কীভাবে ওটার যোগাড় হবে বলো তো ?'

মোনা ওর হাত রাখলো আমার মুখের ওপর। 'প্লিজ, ভাল। এ নিয়ে কোনো কথা বলো না। এমনকি রসিকতা করেও নয়। টাকা পয়সার ব্যাপারে তুমি কোনো চিন্তা করোনতো। কখখনো নয়। বুঝতে পারছো আমার কথা ?'

লিখতে বসা দরকার আমার। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে চিন্তার ঘূর্ণিপাক। কীভাবে শুরু করবো ? ক্ল্যাসিক-

গুলোয় আর একবার নজর বুলিয়ে নেবো কি? নাকি ওসব গুরুগম্ভীর চিন্তার রাজত্ব এড়িয়ে যা দেখবো, যা শুনবো, তাই লিখে যাবো? কিন্তু সাহিত্য করতে গেলে শিল্পের সামগ্রিক চেহারাটা চোখের সামনে একবার অন্তত ভালভাবে মেলে রাখা দরকার। সেখানে কেবল রচনা নয়, রয়েছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত একরম আরো অনেককিছু। যাই বলো, বই পড়ে আর কতোটাই বা জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার স্বাদই আলাদা। আহা, যদি দুনিয়াটা এক চক্কর ঘুরে আসা যেতো। জাপান থেকে জেরুজালেম। লণ্ডন থেকে ল্যাব্রাডর। কিন্তু শিল্পের যথাযথ স্বাদ পেতে হলে ইউরোপই তো যথেষ্ট। নিজস্ব কীর্তিগুলো ছাড়াও সেখানে রয়েছে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মূল্যবান সব শিল্প নিদর্শন। তাহলে চলো, আগে ইউরোপ ঘুরে আসি। আর ইউরোপ ভ্রমণ শুরু করি ইতালি দিয়েই। যাবো, একটু ধাতস্থ হয়ে নিই আগে। তারপর বেরিয়ে পড়বো ইতালির উদ্দেশে।

ফ্রেঞ্চ ইতালিয়ান প্যসারির লনে বসে দুই ইতালিয়ানের সঙ্গে অনেক আলাপ হলো সেদিন। জোয়ে, হাইম, রিষ্টিভ রোমেরো আর মোট্কা লুইসের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমি। সেখানেই ইতালিয়ান দুটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো আমাদের। ইতালি সম্পর্কে আমার অধ্যয়নগত অভিজ্ঞতা আর সেদেশ সম্পর্কে উদ্দোম ওদের খুশি করলো। মোট্কা লুইসের নাচ আর গান শুনেও তারা হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলো একে-

বারে। সঙ্গে সঙ্গে এলো ক্যাভিয়ার, সাদা মাছ আর সোনালী ওয়াইন। তারপর এলো কালো কফি। এর পর আবার একটা দুর্লভ লিকার। 'আরো খাবেন মিষ্টার মিলার?' জিজ্ঞেস করলো মট্‌কু লুইস। 'আপনার কাছে তো সব কিছুই তেমন ভালো নয়।' জোরে বললো, 'কবে আপনি ইউরোপ যাচ্ছেন মিষ্টার মিলার? আপনি যে এদেশে বেশি দিন থাকবেন না, তা আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ওহ—ফিয়েস্তোলে! ঈশ্বরের দোহাই, একদিন আমিও চলে যাবো।'

বাড়ি ফিরতে হলো ক্যাবে। অ্যানেস্থেশিয়া করা মানুষ গান গাইলে যেরকম মনে হয়, আমার অবস্থাও যেন তাই। সিঁড়ির গোড়ায় বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। ওঠে দাঁড়াতে পারছি না। বসে বসে হাসছি কেবল সিঁড়ির ধাপের ওপর। বিড়াল আর পাখিটাকে মুখ ভ্যাংচালাম। দাঁত খিচুনি দিলাম টেলিফোন পোলের দিকে তাকিয়ে। তারপর অনেক কষ্টে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম আমি। কখনো দেয়ালে, কখনো রেলিংয়ে আছাড় খেতে খেতে টলোমলো পায়ে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠতে লাগলাম আমি। ওপরে উঠে দেখি, মোনা তখনো ফেরেনি বাসায়। আমি কাপড়চোপড় জুতো মোজা সুদ্ধ শুয়ে পড়লাম বিছানায়। তারপর তলিয়ে গেলাম নিদ্রার অতল সমুদ্রে। ভোর বেলায় দেখি, আমাকে নাড়াচাড়া করছে মোনা। বমির একটা পুকুরের মধ্যে পড়ে আছি। ইস—একি করেছি! বিছানাটা না পাল্টালেই নয়। মেঝেটাও ধুয়ে

ফেলতে হবে। কাপড়-চোপড়ও খুলে দেয়া দরকার আমার। এমন অবস্থার মধ্যেও আমার মাথা ঘোরাচ্ছিলো। টলমল করছিলো সারাটা দেহ। অথচ হাসছিলাম আমি। আনন্দের হাসি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, মোনা খুব একটা বিরক্ত হয়নি আমার ওপর। খুব সহজ এবং ভদ্রভাবে গ্রহণ করছে সে ব্যাপারটাকে। আমাকে ধরাধরি করে নিয়ে গোসল করালো সে। ঘর-বিছানা মুছলো। বদলালো বিছানার চাদর বালিশ। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারি এক্ষুনি। আমার অফিসে যাবার তাড়া নেই। যতোক্ষণ খুশি শুয়ে থাকবো আমি। আমি এখন এক মুক্ত পুরুষ। একটু পরেই আমার সামনে আসবে একটা জাঁকালো ব্রেকফাষ্ট। যেই আমি চোখ বন্ধ করেছি, দেখতে পেলাম ফ্যাট লুইসকে। জ্বলন্ত চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। কাঁদছে। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে পানি। তার হৃদয় মহিত করে বেরিয়ে আসছে বিচিত্র অথচ শ্রুতিমধুর এক একটি শব্দ—ক্যাপ্রি, সোরেন্তো, আমাল ফি, ফিয়েসোলে, পায়েস্তাম, তায়োরমিনা…ফানিচুলি, ফানিচুলা…আর গিরলাণ্ডো…আর ক্যাম্পোসান্তো…! কী দেশ একটা। আহ্! লোকগুলোও কি দারুণ সেদেশের! আপনি বাজি রেখে দেখুন--আমি একদিন সেদেশে যাবোই। কেন যাবোনা? পোপ দীর্ঘজীবী হোন! (অবশ্য আমি চাইবো তার পাছায় চুমো খেতে)।

সপ্তাহ শেষেই পরিস্থিতি দেখা দেয় অন্যরকম। নিয়ম মাফিক

মদে আর বাচ্চাটাকে দেখতে যাই আমি। ওদের নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াই পার্কে। বাচ্চাটা নাগর দোলায় চাপে হয়তো। কিংবা ঘুড়ি ওড়ায়। হয়তো লেকেও বেড়াই নৌকা ভাড়া নিয়ে। কতো রকম কথাবার্তা হয়। অনর্গল বকবক করে মদে। মনে হয় ছাটগ্রস্ত হয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। আমি ওদের ভরণ পোষণের জন্যে যে টাকা দিচ্ছি, তাতে এখন আর কুলোচ্ছে না। বাচ্চাটাকে পাবলিক স্কুলে না রেখে এবার প্রাইভেট স্কুলে দেয়া দরকার। ছোট রাজকন্যার মান সম্মান থাকছে না বাজে স্কুলে। এর ওপর রয়েছে পিয়ানো শিখা, নাচের ক্লাশ, ছবি আঁকার তালিম। মাখন, মুরগী, মাছ আর অ্যাপ্লিকটের দাম। হাজারো খরচার ফিরিস্তি। তাও ভালো, আমি তোতা পাখী আর কুকুর পোষার কথা মানা করে দিয়েছি। এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সখটাও ধামাচাপা দিতে বলেছি আমি। আগের সেই আসবাবপত্রের পাহাড়। আগের মতোই মেঝে কিংবা আলমারির ওপর অসংখ্য মিছরির বাক্সের ছড়াছড়ি। কিন্তু এখন তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের। খরচটা যদি তাতেও না-কমে তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের অর্থটা কি? বাচ্চাটা চীৎকার করে কাঁদে। কোল থেকে নামতে চায়না। বলে, যেতে দেবোনা, থাকো তুমি।

বলে ওর মায়ের পাশে শুয়ে থাকতে। আমি বিরক্ত হই। আবার দীর্ঘশ্বাসও পড়ে আমার। বাচ্চাটা যখন আমার

কোল থেকে নামতে চায়না এবং অবিরাম চ্যাঁচাতে থাকে, আশে পাশের লোকজন কেমন একটা দৃষ্টিতে যেন তাকায়। কতো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করছে। বেড়াচ্ছে তাদের মা-বাবার সঙ্গে। তারা কতো সুখী। কেবল আমরাই সুখী নই। আমরা দুঃখী, ভীষণ দুঃখী। আলাদা। বিচ্ছিন্ন। বাচ্চাটা দিন দিন বয়োঃপ্রাপ্ত হবে, রোজই বড়ো হয়ে উঠবে সে নিরবে। হয়ে উঠবে আরো সচেতন। এভাবে জীবন যাপন সত্যি এক ধরনের অপরাধ। আচ্ছা, অন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারিনা? আমরা সবাই। মোনা, মদে, বাচ্চাটা, তোতা পাখিটা, কুকুর, বিড়াল ছাতা, সবকিছুই একসঙ্গে? অথবা এমন একটা বন্দোবস্ত, যাতে, এই সাপ্তাহিক পুণর্মিলনের যন্ত্রনাদায়ক অভিজ্ঞতাটি না থাকে। আমরা মূলত সাবাই তো ক্ষতবিক্ষত। রাত্রে, ঘুমের মধ্যে বাচ্চা মেয়েটাকে প্রায়ই আমি স্বপ্নে দেখি। কাঁদি। মোনা পরের দিনই হয়তো জিজ্ঞেস করে, তুমি ঘুমের মধ্যে খুব কেঁদেছো কাল রাত্রে। আমি অবাক হয়ে বলি, 'তাই নাকি? আমি কাঁদছিলাম? আমিই কি? কই, মনে পড়ছে না তো?' কিন্তু মোনা জানে, আমি মিথ্যে-কথা বলছি। হয়তো ওর আশঙ্কা হয় যে, ওর একক সাহাচর্য আমাকে সুখী করতে পারছে না। আমি হয়তো বলে উঠি, 'কাঁদবো কেন আমি? তোমাকে পাবার পর আমার মনে তো কোনো দুঃখই নেই। তাহলে কোন্ দুঃখে কাঁধবো আমি?'

মোনাকে নিরুত্তর দেখে হঠাৎ বোকার মতো আমি বলে উঠি, 'তুমি নিশ্চয়ই একথা ভাবনা যে আমি ওই বাচ্চাটার জন্যে খুব চিন্তিত। ভাবো কি?' মোনা জবাবে বললো, 'বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তুমি ওদের ওখানে যাচ্ছো না। কথাটি কি একবার চিন্তা করেছো?' মিথ্যে বলেনি মোনা। সত্যিই আমি নিয়মিত সেই সাপ্তাহিক দেখা সাক্ষাতে বিরতি দিচ্ছি বেশ কিছুদিন ধরে। খোরপোষের টাকা পাঠাচ্ছি ডাকযোগে অথবা লোক মারফৎ। 'আমি ভাবছি, এ সপ্তাহে তুমি গিয়ে ওদের দেখে এসো ভ্যাল। বিশেষ করে বাচ্চাটা তো তোমারই।' বললো মোনা।

'ঠিক কথা, ঠিক বলেছো তুমি।' বললাম আমি, 'আমি যাবো।' অব্যক্ত একটা শব্দ বেরুলো আমার গলা দিয়ে।

মোনা বললো, 'বাচ্চাটার জন্যে আমি কয়েকটা জিনিস কিনে রেখেছি। এবার তুমি যাবার সময় সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবে।' তা, আমি নিজে কোনো কেনাকাটা করিনা কেন? অবশ্য আমি হাঁটতে হাঁটতে দোকানের শো-উইণ্ডোতে সাজানো জিনিসপত্র দেখি। মনে মনে পছন্দ করি কতো কিছুই তো। কেবল বাচ্চাটার জন্যেই নয়। মোনা এমনকি মদের জন্যেও। কিন্তু একথা আমার মনে হয়না যে, যখন আমার রোজগার নেই, তখন এধরনের কল্পনা বিলাসিতার মানে হয়না। থিয়েটার থেকে মোনা যা উপার্জন করে, তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। বেশ কম।

তবে সোনা খুঁড়েই চলেছে নতুন নতুন সোনার খনি। নতুন এবং পুরনো 'ভক্ত'-দের বদৌলতে সে প্রায়ই আমার জন্যে উপহার দ্রব্যের স্তূপ সহ বাসায় ফেরে। মাঝে মধ্যেই আমার মনে হয়, আমার জন্যে এগুলো আনতে মানা করি ওকে। বলি, 'আমার তো সবকিছু আছে।' এবং কথাটা সত্যও। (বাইসাইকেল এবং পিয়ানো ছাড়া) জিনিস পত্রের পাহাড় জমে গেছে আমার। বরং সে যদি আমাকে একটা মাউথ অর্গান কিম্বা রোলার স্কেট্‌স কিনে দিতো, তাহলেও মনের মধ্যে শিহরণ অনুভব করতে পারতাম আমি।

প্রেমকুঞ্জে আমাদের স্বর্গীয় জীবন যাপনের আনন্দ স্থায়ী হলো মাত্র কয়টি মাস। মাত্র একটি বছর পুরো না-হতেই আমরা দেখতে পেলাম নানা রকম সমস্যা এসে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। নানা রকম অভাব। বস্তুত হতাশাই হঠাৎ হয়ে দাঁড়ালো আমাদের নিত্যসঙ্গী। প্যারিস রওনা হবার আগে পর্যন্ত তিনটে রোগাটে চেহারার লেখাই মাত্র প্রকাশিত হলো আমার। প্রথমটি নিগ্রোদের উন্নয়নের জন্যে নিবেদিত একটি ম্যাগাজিনে, দ্বিতীয়টি এক বন্ধুর পত্রিকায়, যার মাত্র একটি সংখ্যাই ছাপা হয়েছিলো আর তৃতীয় রচনাটি বেরুলো বিশিষ্ট লেখক ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের পুনঃ প্রকাশিত সাময়িকীতে।

যা কিছুই আমি কাগজে পাঠাই, সে সব লেখায় স্বাক্ষর থাকে আমার স্ত্রীর। এতে এটাই প্রমানিত হয়েছিলো যে, কোনো

কাজই একক ভাবে করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি কেবল লিখেই খালাস। তারপর সে লেখা চলে যায় মোনার এখ্‌তিয়ারে। থিয়েটারে মোনার চাকরিটা এখন আর নেই। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে শুরু করলো। মদে এবং বাচ্চাটাকে এখন আর দেখতে যেতে পারিনা। খোরপোষের টাকা দেয়াও অনিয়মিত হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে মোনার ওয়ারড্রোব শূন্য। আমি হাবাগোবার মতো পরতে আরম্ভ করলাম আমার পুরনো পোশাক। যখন প্রচণ্ড শীত পরে গেলো মোনা আমার ওভার কোটটা গায়ে দিলো।

মোনা একটা ক্যাবারেতে কাজ নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি কথাটা শুনতেই পারিনা। প্রতি মুহূর্তে আমি মনোনয়ন, সংবাদ এবং একটি চেক সহ একখানা চিঠির প্রতীক্ষায় থাকি। বিশ থেকে তিরিশটা লেখা ছেড়েছি আমি নানা ঠিকানায়। তারা পোষা পায়রার মতোই যাতায়াত করে। শেষ অব্দি ডাক-খরচা জোটানোই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। মোটকথা, সমস্যা যেন চারদিক থেকেই ঘিরে ধরছে আমাদের।

প্রথম বিপর্যয়ের মাঝামাঝি নাগাদ সাময়িকভাবে উদ্ধার করলো আমার পুরনো বন্ধু ও'মারা। কসমোজে মোনিক টেলিগ্রাফ কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে একদল জেলের সঙ্গে সে চলে গিয়েছিলো ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে সে উপার্জন করে কিছু অর্থ।

ও মারা তার স্বভাবে সুলভ ভঙ্গীতে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে

ধরে প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকলো। উচ্ছ্বাস থিতিয়ে আসার পর নিজের পকেটে হাত দিয়ে সব টাকা পয়সা বের করে রাখলো সে টেবিলের ওপর। তারপর হাসলো। তা, কয়েক শো ডলার হবে। আমাদের দু'এক মাসের ব্যয়ভার এতে দিব্যি নির্বাহ হতে পারে।

'ড্রিংক ট্রিংক কিছু হাতের কাছে আছে নাকি? নেই? ঠিক আছে আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।' বললো ও মারা। তারপর বাইরে চলে গেলো।

যখন ফিরে এলো, ওর হাতে বেশ কয়েকটা বোতল। আর একটা ব্যাগ ভর্তি নানা রকম খাবার-দাবার।

'এখানে রান্নাঘরটা কোথায়? চোখে পড়ছে না তো আমার?'

'রান্নাঘর নেই। আমরা রেঁধে খাই না।'

'কী বললে? রান্নাঘর নেই! এ বাড়ীটার ভাড়া দাও কতো?'

যখন ওকে সব কথা খুলে বললাম, সে বললো, 'তোমাদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছো তোমরা।'

'তাহলে এই হাতির খরচ জুটছে কিভাবে?' মাথা চুলকোতে চুলকোতে ও'মারা জিজ্ঞেস করলো।

'সত্যি কথা বলতে কি,' আমি বললাম, 'আমরা পারছি না।'

মোনার দু'চোখ পানিতে ভরে গেছে।

'তোমরা কেউ কোনরকম চাকরিবাকরি করছো না?' জিজ্ঞেস করলো ও'মারা।

'ভ্যাল কাজ করছে।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো মোনা।

'কাজ করছে মানে লিখছে। তাইতো?' বলে ওঠলো ও'মারা। যেন এই লেখাপত্রের ব্যাপারটা অবসর কাটানোর খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

'নিশ্চয়ই।' প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে ওঠলো মোনা। 'তা, ওকে তুমি অন্য কি করতে বলো।'

'আমি? আমি চাইনা অন্য কিছু করুক সে। আমি কেবল তাজ্জব হয়ে ভাবছিলাম, তোমরা বেচে থাকছো কী ভাবে তাহলে? কিভাবে যে তোমাদের চলছে, তা তোমরাই জানো।'

কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর সে বললো, 'আচ্ছা যে লোকটা আমাকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলো, ওই লোকটাই কি বাড়ির মালিক? দেখ্যি ভালো মানুষ বলে মনে হলো কিন্তু।'

'আসলেও তাই।' আমি বললাম, 'ভার্জিনিয়ার লোক। ভাড়ার জন্যে কখনো তাগাদা করেননি আমাদের। আমি বলব, এক-জন সত্যিকার ভদ্রলোক।'

'ওর সঙ্গেও তাহলে ভালো ব্যবহার করা উচিত তোমাদের।' বললো ও মারা। 'শোনো ভাড়া বাবদ আমরা ওকে এক্ষুণি কিছু টাকা দিয়ে দিই নাহয়।'

'না।' মোনা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো। 'অমন কাজও কর-বেন না প্লিজ। সামান্য দেরী হলে উনি কিছুই মনে করবেন না। তাছাড়া, আমারও কিছু টাকা পাবার কথা শিগগীরই।'

'তাই নাকি?' আমি বললাম উৎফুল্ল কণ্ঠে। অবশ্য এ ব্যাপারে

সন্দেহ আমার থেকেই যায়।

'কথার কচকচি রাখো তো এখন?' বললো ও মারা। গ্লাসে শেরি ঢালতে ঢালতে বললো,' এবার আমরা একসঙ্গে বসে একটু খানি ড্রিংক করবো। আমি খানিকটা হ্যাম আর ক'টা ডিম এনেছি। অল্প একটু পনিরও। কিন্তু ফেলেই দিতে হবে বোধহয়।'

'ফেলে দিতে হবে মানে?' মোনা বললো সবিস্ময়ে। 'আমাদের দু'বার্থারের একটা ছোট্ট গ্যাস স্টোভ পড়ে রয়েছে বার্থরুমে।'

'ওখানেই কি তোমরা রাঁধাবাড়া করো? আশ্চর্য।'

'না, ওখানে রান্না করবো কেন—এমনি ওটা রেখে দিয়েছি। যাতে চোখের আড়ালে থাকে।'

'কিন্তু ওপর তলায় ওদের নাকে তো রান্নার গন্ধ যাবে। যাবে না?' ও মারা বাড়ি অলা আর তার বউয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত করলো।

'অবশ্যই তা যাবে।' আমি বললাম, 'তবে তাঁরা দু'জনেই খুব বিচক্ষণ মানুষ। বুঝেও না বোঝার ভান করবেন।'

'দারুন লোক দেখছি।' বলে উঠলো ও'মারা। 'আসলে দক্ষিণের মানুষগুলোই আলাদা রকমের। তুলনা হয় না।'

পরদিন সকালে ও'মারা বুদ্ধি বাতলালো বাড়ি বদলের। বোঝালো, সস্তা দেখে এবার একটা বাড়ি নেওয়া উচিত আমাদের। 'যে বাড়িতে তোমরা উঠেছো, টাকার ক'াড়ি নিয়ে

বসলেও ফুৎকারে উড়ে যায়। আমি একটা চাকরি বাকরি খুঁজতে শুরু করি। কেননা তাছাড়া দেখছি উপায় নেই। তবে তুমি তো আমাকে জানোই। যাই হোক, কিছুদিনের জন্যে ব্যাপারটাকে আমি হালকাভাবে নেবো।'

আমি হেসে বললাম, 'আরে ঘাবড়াও কেন? তোমার ওপর চেপে বসবো না আমরা। তুমি সঙ্গে থাকলে, বোঝা খানিকটা হালকা বোধ করবো, এই আর কি?'

'কিন্তু ও শোবে কোথায়?' খানিকটা বিরক্ত ভরেই যেন বলল মোনা।

'আমরা একটা খাট কিনে ফেলতে পারি।' টেবিলের ওপর রাখা টাকার দিকে আঙুল তুলে বললাম আমি।

'কিন্তু বাড়িঅলা?'

'আমরা তাকে সব কথাই খুলে বলবো। তাছাড়া, আমরা একজন অতিথিকে এখানে রাখতে পারি অনায়াসেই। টেড যে ভাড়াটে---সেকথা বাড়িঅলার জানায় দরকার নেই।'

'আমি কিন্তু স্রেফ মেঝেতেই শুতে পারি।' ও মারা বললো।

'মাথা খারাপ।' আমি রুখে উঠলাম। 'লাঞ্চের পর পরই আমরা বাইরে গিয়ে একখানা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড খাট কিনবো। জিনিসটা বাড়ির ভেতর আনবো অবশ্য সন্ধ্যা হলেই। কি বলো?'

মোনার মুখটা ভার। ব্যাপারটাকে সে সহজভাবে নিতে পারবে না বলেই মনে হলো। মুলত ও মারার এখানে আশ্রয়

নেয়াটা আদৌ মনঃপুত নয় তার। আমি তখন বললাম, 'শোন মোনা।' আমি বললাম, 'টেড কিছুদিন এখানে থাকার পর ওকে তোমার এতোটা খারাপ লাগবে না। কেননা তাতো-দিনে তুমি ওকে জেনে ফেলবে। আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই চিনি ওকে। কি ঠিক বলনি টেড?'

'আমি অন্য কোনো ব্যাপারে ওর ওপর কিছু মনে করিনি।' মোনা বললো, 'কিন্তু আমরা কি করবো, আমাদের কি করা উচিত বা অনুচিত, সে ব্যাপারে তার অতোটা হস্তক্ষেপ আমি অপছন্দ করি।'

'মোনা ঠিকই বলেছে টেড।' বললাম আমি। 'তুমি একটু বেশি চিন্তা করো ভবিষ্যত নিয়ে। আর তুমিও তা জানো। তোমার সঙ্গে শেষবার দেখা হবার পর অনেক দিন চলে গেছে কিন্তু। এর মধ্যে ঘটে গেছে অনেক কিছুই। আমরা এখন এক ভিন্ন পৃথিবীর বাসিন্দা। এই অল্প ক'দিনের দুরবস্থার কথা বাদ দিলে আমরা কিন্তু জাঁকজমকের সঙ্গেই জীবন যাপন করছিলাম। এবং তা এই মোনারই বদৌলতে। এবং এখন যদি দুজন দুজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি--ব্যাপারটা কি ভালো দেখায়?'

'আমি, ও মারা বললো, 'তোমাদের ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তল্পিতল্পা গোটাবো এখান থেকে।'

'আমি দুঃখিত।' মোনা বললো, 'আমি যদি তোমার মনে কোনো ভুল ধারনার জন্ম দিয়ে থাকি। তুমি ভ্যালের বন্ধু

তো ?'

'ভ্যাল ? এ আবার কি জিনিস ?' জিজ্ঞেস করে ও মারা।

'ও আমাকে ভ্যাল বলেই ডাকে।' আমি বললাম, 'তুমিও হয়তো খুব শিগগীরই আমাকে হেনরী না-বলে ভ্যাল নামেই ডাকতে শুরু করবে।'

'আদপেই না।' ও মারা বললো, 'আমি তোমাকে হেনরী ছাড়া অন্য কোনো নামেই আর ডাকবো না।'

ও মারা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে যা কামিয়ে এনেছিলো, তাতে আমাদের কিছুদিন বেশ ভালোই কাটলো।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি বাতলে দিলো ও মারা। বললো, 'তোমার এই গদ্য কবিতাগুলো ছেপে নিয়ে তা ঘুরে ঘুরে বিক্রী করলেও তো দু'পয়সা ঘরে আসতে পারে।' একদিন আমার লেখা-গুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে মুখ কুঁচকে বলেছিলো সে। বলে-ছিলো, 'তোমার এ লেখায় মর্ম কোনো সম্পাদকই বুঝতে পারবে না।' কথাটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ওর পরা-মর্শটা বেশ মনে ধরেছিলো আমার। আমার বন্ধুবান্ধব আর শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তারা সবাই আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আগ্রহী। অন্ততঃ কথাবার্তায় আমার সেরকমই মনে হতো। সুচনা হিসেবে এদের কাছেই তো আমি সরাসরি আমার রচনা বিক্রী আরম্ভ করতে পারি।

আমার এতে সম্মতি আছে শুনে ও মারা তো খুব খুশি। আমি ডাক যোগেও বেচতে পারি পুস্তিকা। ও মারা হেঁটেই যেতে পারে, বিভিন্ন অফিসে তাছাড়া ওর বন্ধুর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। ছোটখাটো একটা প্রেসও আমরা পেয়ে গেলাম, যেটির মালিক এক ধরনের শক্ত কাগজে অতি অল্প খরচে তা ছেপে দিতে রাজি হলো। সপ্তাহে একবার বেরুবে পুস্তিকাটি। প্রতি সংখ্যা ছাপা হবে পাঁচশ কপি। রচনা গুচ্ছের নামকরণ করা হলো 'মেজোটিন্‌টস'। হুইস্‌লারের প্রভাব লক্ষ্য করতে পারে কেউ কেউ---অনেকটা সেই কায়দায় স্বাক্ষর—হেনরী ভি মিলার।

মজার ব্যাপার এই, 'দ্য বাউয়ারি ফিনিক্স' নামে যে কিস্তিটা ওই প্রকল্পের জন্যে আমি প্রথম লিখি, আমাকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছিলো 'বাউয়ারি সেভিংস ব্যাঙ্ক-এর স্থাপত্য মাত্র। এর ভল্টে রাখা সোনাদানা নয়। পাঁচশো কপিই বিক্রী করতে সক্ষম হলাম আমরা। কিন্তু তাতে অর্থাগম যা হলো, সে আর না বলাই ভালো। ভেবেছিলাম কিছু বার্ষিক গ্রাহক করবো বন্ধু-বান্ধবদের ভেতর থেকে। কিন্তু তাতেও খুব সাড়া পাওয়া গেলোনা। কেননা, বড়ো জোর দু'তিন মাসের মধ্যেই যে আমার পরিকল্পনা আবার পাল্টে যাবে—তা সবাই জানে। তবে হ্যাঁ মাসিক চাঁদাটা আগাম নিতে পারতাম কারো কারো কাছ থেকে। ও মারা বললো, 'তোমার অমন আধমরা বন্ধুদের চাইতে অচেনা লোকদের কাছে এগুলো

বিক্রি করা অনেক ভালো।' রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও আমাকে লিখতে বসার জন্যে তাগিদ দিতে শুরু করতো। শহরের প্রায় সবটাই চুঁড়ে ফিরতো ও মারা। ব্রুকলীন, মানহাটান, ব্রনক্স, স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড সর্বত্র। তাতে কাজ হতো। বিশেষ করে অগ্রিম চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টাই সে বেশি করতো।

'মেজ্জে টিনট্সের তিনটি কিস্তি বেরুবার পর মোনার মাথায় বুদ্ধি এলো আর একটা। নিজের নাম সই করে সে ফিরি করে সেগুলো বেচবে বিভিন্ন নৈশ কেন্দ্রে। তার ধারনা অর্ধ-মাতাল লোকগুলো খুব বিপদজনক নয়। তাছাড়া এরকম একটা সুন্দরী মেয়েকে উপেক্ষা করাও বেশ কঠিন হবে ওদের পক্ষে। ও মারার পছন্দ হলো না বুদ্ধিটা। তার মতে এতে বিন্দুমাত্র ব্যবসা বুদ্ধিও নেই। কিন্তু মোনা ঝোলাঝুলি করতে থাকলো এই বলে যে, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। আমার নামের জায়গায় মলাটের ওপর শোভা পেতে লাগলো মোনার সই। তফাৎটা ধরতেই পারবে না কেউ।

মোনা যখন নৈশ অভিযানে বেরোয় আমি আর ও মারা বেরিয়ে পড়ি তখন উপাদানের খোঁজে। আমাদের হাবভাব এমন হয়, যেন আমরা কোনো বিরাট প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বেরিয়েছি ডিউটি দেবার জন্যে। সবখানেই যাই আমরা। সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখি। এক রাতে আমরা প্রেস-বক্সে বসলাম 'ছ'দিনের বাইক রেস' দেখবার জন্যে। পরের রাতে গেলাম

মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে। কোনো কোনো রাতে আমরা হেঁটে বেড়াই চীনা-পল্লীর আশ্পাশ পাস্তলা। একদিন ভাবলাম, একবার নেডের কাছে গেলে কেমন হয়? ও আমার বন্ধু। ছবি আঁকে। আমাদের কাগজটা সচিত্র নয়। কেমন নেড়া নেড়া যেন। মনে করলাম এক-আধখানা স্কেচ ফেচ থাকলে দিব্যি খোলতাই হবে। যাই তাহলে নেডের কাছে।

দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, নেড সেসময় ওখানে ছিলো না তার বদলে খুব ধারালো চেহারার একটা ব্লণ্ড মেয়েকে পেয়ে গেলাম সেখানে। মেয়েটার পা থেকে মাথা অব্দি সেক্স থৈ থৈ করছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা ওকে প্রস্তাব দিলাম আমাদের সঙ্গে একটা ড্রিংকের। মেয়েটি সেই ধরনের গুমড়া মুখো কুত্তী—যারা বেড়ে উঠেছে নেওয়ার্ক অথবা স্যাণ্ডাস্কির মতো জায়গায়। তার হাসির সঙ্গে হায়েনার হাসি যেন মিলে যায়। সে তার কমোডিয়ান বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু ছোকরার পাত্তাও নেই। পাশের নাচ গানের আসর থেকে একদল মেয়ে এসে লনের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে জিরোতে লাগলো। আমি একটাকে ডেকে নিয়ে বারে বসে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম তার সঙ্গে। মনে হলো, মেয়েটা সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বেহালা বাজানো নিয়েই থাকতে চায়। অত্যন্ত সাদামাটা মেয়ে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক আউন্স যৌনতা নেই। কিন্তু বুদ্ধিমতী এবং সহানুভূতিশীল। ইতিমধ্যে নেড এসেছে। কথাবর্তা শেষ

করে গিয়ে বসেছে সেই সোনাচুলো মেয়েটার মুখোমুখি। তার হাবভাবে মনে হচ্ছে, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও মেয়েটাকে নিয়ে যেতে চায় নিজের ষ্টুডিওর ভেতরে।·· হকোবেন স্ট্রীটের বারলেস্কে এসে আজ যে অভিজ্ঞতা জন্মালো, তাতে আমার লক্ষ্যমাত্রার আড়াই শো লাইন কেন—তিন হাজার লাইন অনায়াসে নামিয়ে ফেলতে পারি আমি।

মোনাও কিন্তু তার বিক্রীবাটা সেরে রাত ছুটোর আগে ফিরতে পারেনা কোনোদিনই। তার অভিজ্ঞতাও অতি বিচিত্র। মাঝে মধ্যেই সে ছুটে যায় অ্যালান ক্রমওয়েলের মতো একটা লোকের কাছে। নাইট ক্লাবের পোকা এই নিশাচর লোকটি নিজের পরিচয় দেয় ওয়াশিংটন ডি, সি'র জনৈক ব্যাঙ্কার বলে। মোনাকে মুখোমুখি বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্রেফ বকবক করতেই ভালোবাসে ক্রমওয়েল। সে চায় মোনাও সমান তালে কথাবার্তা বলুক তার সঙ্গে। মোনার মতে, লোকটা বেশ রুচিবান প্রথম থেকেই মোনার সঙ্গে যতগুলো কপি অবশিষ্ট থাকে—তার সবগুলো কিনে নিচ্ছে ক্রমওয়েল। এক শাদা 'মেজ্জোটিনটসের' দাম হিসেবে সে পঁচাত্তর থেকে আশি ডলার দেয় মোনাকে। যখন আড্ডা ছেড়ে সে উঠে যায়, পুস্তিকাগুলো সঙ্গে নিতে সে নিয়মিতভাবে ভুলে যায়। এই বিস্মৃতি যে ইচ্ছাকৃত তা বোঝাও যায়। বিশুদ্ধ ভদ্রলোক নয় কি? অবশ্য নিউইয়র্কে ব্যাঙ্কের কাজে আসেন তিনি দশ দিন পর পর। এসে ভর করেন গোল্ডেন ঈগল কিংবা মৈটিটসনেস্টে। 'সত্যিকার ভদ্রলোক'

হওয়া সত্ত্বেও পিপে পিপে মদ খান। এবং বিদায়ের আগে নিয়মিতভাবে মোনার করতলে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট রাখেন পুস্তিকার দাম ছাড়াও। দয়ার দান নয়। স্রেফ তাকে সঙ্গ দেবার সম্মানী হিসেবে। এরকম বহু নিঃসঙ্গ আত্মা মোনা দেখতে পায় তার চারপাশে। ক্রমওয়েলের মতোই টাকা-পয়সা অলা মানুষ সব। তাদের সঙ্গেও মোনার মেলামেশা রয়েছে। আর কি চাই তার? শিগগীরই আমার কানে আসে এরকম বেশ কয়েকটা মক্কেলের খবর। এক বিরাট বড়ো-লোক—বছর চুক্তিতে ওয়ালডর্ফ হোটেলের একটা পুরো স্যুট রিজার্ভ করে রেখেছে—মোনার সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে। রয়েছে সবোর্ণের অধ্যাপক মোরেওর মতো মানুষ, যে নাকি ছুটো মনের কথা বলার জন্যে মোনাকে নিয়ে যায় বহুবল্লভ সরাইখানায়। আসে টেক্সাসের এক তেল কোম্পানির মালিক নিয়োবার্গার, যে লোকটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়ার পরও পাঁচ ডলার বখশিস দেয়। মিলাওয়াকির এক মদের কারখানার মালিক ছিলো এক বুড়ো। সে আবার সঙ্গীত ভালোবাসে। নিউইয়র্কে এসে প্রথমেই সে খোঁজ করবে মোনার। তারপর ওকে নিয়ে শুনতে বেরোবে কনসার্ট। এবং এইভাবে মোনার যা আমদানী হয়, তাতে ও মারা আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই যে, পুস্তিকার প্রকাশনা আমরা অব্যাহত রাখবো ঠিকই, তবে তা ঘুরে ঘুরে বিক্রি করার খুব একটা প্রয়োজন নেই বোধহয়। স্বাভাবিক বিক্রির পর সপ্তাহের শেষ দিকে যে

কপিগুলো থেকে যায়, আমরা তা বিভিন্ন পাঠককে পড়াবার ইচ্ছায় বিনে পয়সায় পাঠাতে শুরু করলাম। কখনো বা পাঠাই সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের নামে। কখনো বা আবার ওয়াশিংটনে সিনেট সদস্যদের ঠিকানায়। বড়ো বড়ো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কাছেও আমরা কাগজ পাঠাতে শুরু করলাম স্রেফ মজা করার জন্যে। কী ঘটে তা দেখবার জন্যে। আমরা টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানা জোগাড় করি। একদিন আমরা 'মেজ্‌ জোটিনটের' বিষয়সূচী টেলিগ্রাম করলাম লং আইল্যাণ্ডের এক পাগলা গারদের পরিচালকের নামে। আমরা খুবই অস্পষ্ট অথবা দুর্বোধ্যভাবেই নাম সই করি তাতে। উদ্ভট এক একটা নাম, যেমন অ্যালয়সিয়াস ফ্যাণ্টেকস্ট ওগেগা, স্রেফ প্রাপককে ধাঁধাঁয় ফেলে দেবার উদ্দেশ্যে।

সেদিন ব্রেকফাস্টের পর মোনা বললো, সে একটু বাইরে যাবে। জরুরী ব্যাপার। আমাকে সে নিশ্চয়তা দিলো, এসে ডিনার খাবে একসঙ্গে। মোনা বাইরে বেরিয়ে যাবার পর আমারও আর ঘরের ভেতরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। বেরিয়ে পড়লাম আমিও খানিকটা বাদেই। ভেবেছিলাম টাইমস স্কোয়ারের ওদিকটায় গিয়ে হাঁটাহাঁটি করবো। কিন্তু ভুলক্রমে আমি নেমে পড়লাম গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রালে। ম্যাডিসন এভিনিউয়ে কেবলমাত্র পা রেখেছি, দেখি, আমার বন্ধু নেড। মহৎ শিল্পকর্মের জগৎ থেকে সে আবার ফিরে এসেছে অ্যাড-

ভার্টাইজিংয়ের পৃথিবীতে। আমাকে দেখেই দু'চোখ বড়ো বড়ো করে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বললো, 'আশ্চর্য! আরে আমি তো মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম। নিশ্চয় ঈশ্বর নিজে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন হেনরী। এমন শাঁসালো একটা কাজ শুরু হয়েছে অথচ সব ব্যাটার অসুখ। সবগুলো বাড়িতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। বলতে বলতে এক তাড়া কাগজ উঁচু করে ধরলো নেড 'এগুলো আজ রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে। যে করেই হোক। জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন বলতে পারো। তুমি হাসছো? আমি কিন্তু সিরিয়াস। আচ্ছা, অপেক্ষা করো আমাকে খুলে বলতে দাও আগে।'

আমি বসে বসে সব শুনলাম। বাজারে শিগগীরই একটি নতুন পত্রিকা বেরুচ্ছে। সেখানে একটি লেখা দিতে হবে নেডকে। কিন্তু লেখার একটা ছকই কেবল তার মাথায় রয়েছে। এক লাইন এগোতে পারেনি।

'তুমি এটা করতে পারবে।' নেড বললো, 'আমি নিশ্চিত বুড়ো ম্যাকফারল্যাণ্ডকে তোমার মনে আছে কি? তিনিই বের করছেন এই কাগজটা। মানে নেপথ্যে আছেন তিনি যেভাবেই হোক, কাগজটা অবিলম্বে বাজারে ছাড়বার জন্যে চাপ দিচ্ছেন তিনি।'

প্রস্তাবটি লোভনীয় দেখে রাজি হয়ে গেলাম অবিলম্বে। এবং বসে গেলাম টাইপ-রাইটারের সামনে। দু'তিন পাতা লিখেছি

কি লিখিনি, আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লেখাটা পড়েই নেড 'বাহবা' বলে লাফিয়ে উঠলো।

'ভালো লাগছে?'

'ভালো মানে? অপূর্ব, অপূর্ব। যার ওপর এই লেখাটার দায়িত্ব ছিলো, তুমি তার চেয়ে বহুগুণ ভালো লিখছো। ম্যাক ফারল্যাণ্ড এ লেখা পড়ে পাগল হয়ে যাবে একেবারে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? চলো, তোমাকে বুড়োর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বলবো, একে দিয়েই এই লেখাটা লিখিয়েছি আমি এবং পত্রিকায় চাকরি নেবার জন্যে রাজি করিয়েছি।'

'কিন্তু আমি তো চাকরি করতে চাই না।'

'তোমার চাকরি নেবার দরকার নেই। অবশ্যই নেই। আমি ওকে নিশ্চিন্ত করতে চাই, এই আর কি। তুমি ওখানে গিয়ে কথাবার্তা বলবে আরকি। একটা ম্যাগাজিন বের করতে হলে কি কি করা দরকার, বুঝিয়ে বলবে। ব্যাস্, তাহলে আর দেখতে হবেনা। কি চাও তুমি ওর কাছে পত্রিকার ব্যাপারে দরাজ দিল হয়ে আছেন উনি এমুহূর্তে।'

'কিন্তু একটা সাময়িক পত্র সম্পর্কে আমার ধারনা খুব পরিস্কার নয়। তুমিই বরং দায়িত্বটা নিয়ে নাও। যদি চাও, আমি তোমার পেছনে থাকবো।'

'আরে না না। তুমিই কথা বলবে। স্রেফ একটা রূপরেখা তুলে ধরবে ওঁর সামনে। তোমার যেভাবে মনে আসে

সেভাবে বলবে। তোমার লেখায় একবার চোখ বুলোলে তুমি যা বলবে, তাই শুনবেন ম্যাকফারল্যাণ্ড।'

যেকথা সেই কাজ। নেড আমাকে পাকড়াও করে সোজা নিয়ে হাজির করলো ম্যাক ফারল্যাণ্ডের খাস কামরায়।

'মিস্টার ম্যাকফারল্যাণ্ড' নেড বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললো, 'ইনি আমার খুবই পুরনো এক বন্ধু। এঁর কাছে আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম। এমুহূর্তে উত্তর ক্যারোলিনায় একটি বই লেখার কাজে ব্যস্ত আছেন ইনি। আমি ওঁকে অনুনয় বিনয় করে জানিয়েছিলাম, একটুখানি এসে আমাকে ম্যাগাজিনের ব্যাপারে সাহায্য করতে মিস্টার মিলার ইনিই হচ্ছেন মিস্টার ম্যাক ফারল্যাণ্ড।'

দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। নেড বলে উঠলো, 'একটু আগেই ট্রেন থেকে নেমেছেন। আর নেমেই লিখে ফেলেছেন এই রচনাটি।'

'আপনি একজন লেখক। তাই না?' বলে লেখার ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন ম্যাক ফারল্যাণ্ড।

'আপনারাই তার শ্রেষ্ঠ বিচারক।' আমি বললাম কূটনৈতিক চালে। লেখাটি নিরবে পড়ে, আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ। বেশ খুশিই হয়েছেন, বোঝা যায়। বললেন, 'বেশ ভালো হাত আপনার। তা, কতোদিন ধরে লিখছেন? এই ধরনের লেখা কি আগে কখনো লিখেছেন?'

স্বীকার করলাম, লিখিনি।

'আমি সেই রকমই ভেবেছিলাম। যাই হোক, লেখা আমার পছন্দ হয়েছে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গীটা বেশ টাটকা, তাজা তাতে অন্যরকম একটা কিছু আছে। আর ভাষা তো খুবই সুন্দর। আপনি এখন কিসের ওপর কাজ করছেন জানতে পারি কি?'

বৃদ্ধকে আমার এতোটাই পছন্দ হয়েছে যে তাঁর কাছে মিথ্যে বলবার ইচ্ছে হলো না আমার। বললাম, 'সত্যি বলতে কি, কেবল মাত্র লিখতে শুরু করেছি। আমি অনেক কিছুই করতে চাই। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো কিছুই পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করেনি। আমি কয়েক বছর আগে একটা বই লিখেছিলাম কিন্তু খুবই কাঁচা কাজ বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে।'

'শুনে ভালো লাগলো। বিশ্ব প্রতিভাবানের অলঙ্কার।' বৃদ্ধ বললেন, 'আশা করি আপনার গুনাবলীকে আমরা কাজে লাগাতে সক্ষম হবো।' আমি বুঝতে পারলাম না, এই বক্তব্যের পর আমি কি মন্তব্য করবো। হঠাৎ নেড এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমার সম্পর্কে তার নিজের উঁচু ধারনার কথা একে একে তুলে ধরতে থাকে।

অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর ম্যাকফারল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, আপনি কি আমার জন্যে একটা সিরিয়াল লিখতে পারবেন? ঠিক আপনি যেভাবে একটু আগে কথা বললেন,

সেই ভঙ্গীতে ?'

'জানিনা, পারবো কিনা। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।' আমি বললাম।

'চেষ্টা করে দেখবেন ? মানে ?' বৃদ্ধ তেড়িয়াভাবে বলে উঠলেন, 'আপনি সিরিয়াসলি লিখতে চেষ্টা করুন।' নেডকে আমার লেখা পৃষ্ঠাগুলোকে দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু এতে আমার বক্তব্য টা ঠিকমতো আসেনি। তুমি বরং এজন্যে অন্য কাউকে।'

'সেরকম কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না।' বললো নেড। 'পাওয়া যাবেও না।'

'যাওতো, বাইরে গিয়ে খুঁজে দ্যাখো। কপি-রাইটার পেতে অসুবিধে কোথায় ?'

'হ্যাঁ স্যার।' নেড বললো।

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনুন। আপনি এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে আমার কাগজের জন্যে ধারাবাহিক লেখাটি লিখতে শুরু করে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি আরম্ভ করে দিতে চাই আপনার সিরিয়ালটা। বেশি ভারিক্কি সাহিত্যিক রচনা হবে না ওটা। ঠিক এখুনি আগে আমার সঙ্গে যেরকমভাবে কথা বললেন, সেই ভাবে বেশ হালকা চালে, খানিকটা ব্যাঙ্গাত্মক ঢঙে লিখতে হবে আপনাকে। বুঝতে পারলেন আপনি কি কোনো ষ্টেনোগ্রাফারকে ডিক্টেশন দিতে পারবেন ? মনে হয় পারবেন না। খুব খারাপ কথা।

খুব খারাপ কথা। আপনি লিখতে শুরু করুন। আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো চীনে, ভারতে, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকায়। স্পেনে যেতে চান আপনি। পৃথিবীটা মস্ত বড়ো। এবং আপনার মতো মানুষকে স্বাগত জানাবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই আছে। আমার যখন একুশ বছর বয়েস--তখন আমার দু'বার দুনিয়াটা চক্কর দেয়া হয়ে গেছে। পঁচিশ বছর বয়েসে আটটা ভাষা রপ্ত করি আমি। তিরিশ বছর বয়সেই আমি মালিকানা অর্জন করি একগুচ্ছ পত্রপত্রিকার। একজন কোটিপতিকে কয়েকবার গুণ করলে যা দাঁড়ায়, আমি তাই। কিন্তু এতে কি আসে যায়? টাকাই দুনিয়ায় সব কিছু নয়। কখনো টাকার জালে জড়িয়ে পড়বেন না। আপনার যদি সাহস এবং কল্পনা শক্তি থাকে, টাকা কোনো সমস্যা নয়। এমন অনেক লোকই তখন পাবেন, যারা টাকা ধার দেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছেন আপনাকে। ওহ, বড্ড খিদে পেয়েছে। ওহে নেড্, কাউকে দিয়ে কিছু স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে দাও না। লাঞ্চ করার কথা আমার একদম মনে নেই।'

'আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসছি।' বললো নেড।

'বেশি করে এনো।' বুড়ো বললেন, 'আমাদের সবার জন্যে। আর হ্যাঁ, কফিও এনো সেই সঙ্গে। কড়া কফি।'

পরের দিন ও মারাও নিয়ে এলো আর এক চমক।

'হেনরী তোমার জন্যে মস্ত সুখবর নিয়ে এসেছি। ম্যাক গ্রেগরের অফিসে একজন টাইপিষ্ট নেবে।'

'আমার চাকরির ব্যাপারে তোমার এই চিন্তাভাবনার জন্যে ধন্যবাদ।' বললাম আমি। 'কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কোনো চাকরির দরকার নেই। একটা মস্ত বড়ো কাজ আজকেই আসছে আমার হাতে। কাজ মানে, গুরুদায়িত্বই একটা বর্তেছে আমার ওপর।'

'তাই বুঝি?' লাফিয়ে উঠলো ও মারা। 'খুলে বলো, খুলে বলো। ওর যেন তর সয় না।

আমি আস্তে আস্তে পুরো ঘটনা খুলে বললাম ও মারাকে।

'ও, এই কথা। তা বেশ তো।' ও মারা বললো, 'বিদেশ সফরে বেরিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত, সিরিয়াল লেখার পাশা-পাশি এই চাকরিটাও তুমি করতে পারো। মাসে নগদানগদ আশিটি ডলার কম কিসে?'

এমন সময় মোনা এলো। সে আমাদের বাক্যালাপের অংশ-বিশেষ শুনতে পেয়েছে। বললো, 'কী এসব আবলতাবোল বকছো তোমরা? চাকরি টাকরির কথা শুনতে পাচ্ছিলাম যেন কিসের? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

আমি তখন সমস্ত কথা খুলে বললাম মোনাকে।

মোনা তা শুনে খুশি হলো না বেজার হলো, বোঝা গেলো না।

৩

রঙ্ মেয়েটাকে প্রথম ন্যাংটোই ভেবেছিলাম আমি। রাঙা কাইবারের চেয়ারে বসা কুত্তীটাকে দেখে কে বলবে, তার গায়ে এক গাছি সুতো আছে। কিন্তু পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ভুল ভেঙ্গে যায়। গরমের জন্যে খুব পাৎলা এবং স্কিন-টাইট স্ল্যাক্স পরেছে সে। আর স্ল্যাক্সের রঙটাও এমন, যা ওর শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশেই গেছে বলা যায়। ফলে দশ-পনেরো হাত দূর থেকেই ধাঁধা লাগাবে যে কোনো লোকের। একটা খালি কফির পেয়ালা আঙুল দিয়ে প্লেটসুদ্ধ টেবিলের ওপর ঘোরাচ্ছিলো সে।

নেড এখনো আসেনি। ওর জন্যে কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। বার্লেস্কের সামনে ভীড় জমতে শুরু করেছে এর মধ্যে। একজন দু'জন করে শিল্পীরাও আসছে। ঢুকে পড়ছে গ্রীনরুমে। যন্ত্রশিল্পী আর অন্যান্য কলাকুশলীদের হাসা-হাসি করতে দেখা যাচ্ছে পাশের হলরুমটায়। সিরিয়ালের প্রথম কিস্তটা পাঠকের কেমন লেগেছে, জানি না, কিন্তু ম্যাকফারল্যাণ্ডের কাছে দুর্দান্ত মনে হয়েছে। তিনি একা-

ধিক ইন্টনলমেন্ট একবারে জমা দিতে বলেও আবার সংশোধন করেছেন নিজের নির্দেশ। বলেছেন, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আস্তে আস্তে লিখুন। যখন বাইরে যাবেন, কিস্তির সংখ্যা তখন স্বাভাবিকভাবেই বাড়াতে হবে। আপাতত অতোটা ব্যস্ততার খুব একটা প্রয়োজন দেখিনা। আগাম টাকাও দিয়েছেন বৃদ্ধ, যা দিয়ে বাড়িভাড়া শুধিয়ে কিছু কাপড়চোপড় কিনতে পেরেছি আমি মোনা, মদে আর বাচ্চা মেয়েটার জন্যে। পোশাক আশাকে আমার নিজের খুব একটা ঝোঁক নেই। তবু মোনা কোত্থেকে কিনে এনেছে একটা দামী শার্ট। একটা টাই আর এক জোড়া মোজা। এক জোড়া প্যান্ট বানানো চলবে, এরকম খানিকটা কাপড়ও সে যোগাড় করেছে কীভাবে, তা সে-ই ভালো জানে।

নতুন কিস্তির লেখা নিয়ে এসেছি আজ। নেড অবশ্য নিজেই সংগ্রহ করতে চেয়েছিলো আমার বাসা থেকে। কিন্তু বাসায় এমনিতেই সেখানে ও'মারা ডেরা বেঁধেছে। আনাগোনা শুরু হয়েছে ম্যাক গ্রেগরের। ক্ষ্যাপা শেলডন আর মারজুরি তো বাড়িটাকে বানিয়ে তুলেছে শেয়ালের গর্ত। মোনার মত সহিষ্ণু মেয়ে পর্যন্ত বিরক্তের একশেষ। এ অবস্থায় আর এক আধ পাগলা আর্টিস্টকে বাসার ঠিকানা দিয়ে বিপদে পড়তে রাজি ছিলাম না আমি। কিন্তু নেডের তো এর মধ্যে এসে পড়বার কথা।

আড় চোখে ব্লণ্ডমেয়েটার দিকে চেয়ে পাশের একটা টেবিলে

বসে লেখাটি মেলে ধরলাম চোখের সামনে। এক টানে টাইপ করে এনেছি। চোখ বুলোবারও সময় হয়নি। বেয়ারাকে একটা বীয়ার দিতে বলে আমি আমার লেখার পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছি, হঠাৎ নেডের প্রবেশ। প্রথমে সে আমাকে খুব সম্ভব দ্যাখেনি। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে শিস দিয়ে উঠলো সে। মেয়েটা হাসি হাসি মুখ করে ঠোঁট ছুটোকে আংটির মতো গোল করে ভ্যাংচালো নেডকে। নেড ছু'হাতের আঙুলে একটা অশ্লীল যৌন-মুদ্রা তৈরীর প্রয়াস নিতে গিয়েই আমাকে দেখে ফেললো। 'আরে, হেনরী। অমন অন্ধকার কোণায় গিয়ে বসে আছো কেন বৎস। পাঁচ গজের মধ্যে এমন একটা জলন্ত গোলাপ রেখে কেউ অমন হাড়ের মতো সাদা কাগজকে আদর করে নাকি।'

'খুব মৌজে আছো দেখা যাচ্ছে।'

'মৌজের এখনি কি দেখেছো। ম্যাকফারল্যাণ্ড শিগগীরই আমাকে চেন অব ম্যাগাজিনস— এর আর্ট-ডিরেকটার করছে। মৌজ দেখবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পাবার পর। বুঝলে।'

নড এক রকম টেনে হিচ'ড়ে আমাকে নিয়ে মুখোমুখি বসালো ঘন কুন্তলার। মেয়েটাকে আমি গত মাসেই দেখেছি এখানে। এই বার্লেস্কের ভাঁড়ের প্রেমিকা বলে রটিয়ে বেড়ায় নিজেকে। কিন্তু সেদিনকার মতো আজও ওকে একা দেখছি টেবিলে। কৌতুকাভিনেতার টিকিটিরও দেখা নেই। পরিচয় পর্ব শেষ

হলে প্যাস্ট্রি আর শেরির অর্ডার দিলো নেড। তারপর মেয়েটার দিকে ঝুঁকে বললো, 'তোমার কিছু ছবি আঁকতে চাই বেবি। মানে টানা স্কেচ আর কি। বুঝতেই পারছো —আমার স্টুডিওতে। কিছু ফটোগ্রাফও আমার দরকার। আমাদের মহিলা পত্রিকায় কভারে ছাপার মতো ধারালো মুখ পাচ্ছি না। কিছু ফটোগ্রাফও তোলা যাবে একই সঙ্গে। না না— ফ্রি সার্ভিস নয় ডার্লিং— তোমার জন্যে একটা ভালো রকম বরাদ্দ রয়েছে। একেবারে নগদানগদি।' আমার দিকে চেয়ে বললো, 'মুখটাকে অমন গোমড়া করে রাখলে চলবে না দোস্ত। একটু খানি হাসো। আমরা এখান থেকে সোজা চলে যাবো আমার স্টুডিওতে। হাতে সময় নেই একদম। বুড়ো বড্ড তাড়া দিচ্ছে। নুড আঁকার সময় আমার পাশে আর একটা লোক না-থাকলে আমি মুড পাইনা। মানে নুড আর মুড আমার কাছে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। কাজেই তুমি আমাকে সঙ্গ দেবে— বুঝতে পারছো হেনরী।' একদমে অনেকগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগলো নেড। তারপর প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে প্যাস্ট্রির টুকরো মুখের ভেতরে নিক্ষেপ করলো সে। মেয়েটা বারবার আড় চোখে চেয়ে দেখছে আমাকে। ওর তাকানোটা খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে। শরীরের ভেতর এক ধরনের শিহরণ অনুভব করছি অনেক দিন পর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোরাচোখে আমিও বার কয়েক মেয়েটিকে দেখতে গিয়ে একসংগে ধরা

পড়ে গেলাম দু'জনের কাছেই। নেড 'সাব্বাস' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে আমার পিঠের ওপর মৃদু থাপ্পড় লাগালো এক-বার। মেয়েটা যেন লজ্জাই পেলো ওর প্রগলভতায়। তবে এটাও বুঝতে দেরী হয় না যে এরকম লজ্জা পাওয়ার অভ্যাস আছে তার আগে থেকেই। আমি অগত্যা সামান্য একটু হাসলাম। চক্ষু লজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। আমাকে হাসতে দেখে আশ্বস্ত হলো নেড। যেন আমাকে হাবার মতো বসে থাকতে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলো।

সন্ধ্যার আগেই আমরা ঢুকলাম নেডের কর্মস্থলে। স্টুডিওটা আগেও আমি দেখেছি। ইদানিং শ্রী ফিরেছে বলে মনে হয়। বেশ জমকালো করে সাজানো। কাঠের প্যানেল, পার্শিয়ান গালিচা, পেতলের টব আর সুদৃশ্য বাবে সাজানো সুগন্ধী কক্ষটি। আমাকে আর মেয়েটিকে বসিয়ে রেখে সে আলমারি খুলে বের করে আনলো এক বোতল চিয়ান্তি। পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো বরফ আর গবলেট। আর কিছু পট্যাটো-চিপ্‌স।

ইতিমধ্যে মেয়েটির সঙ্গে আমার মোটামুটি ভাব জমে গেছে যদিও আমার কোনো লেখাই সে পড়েনি, তবে তার প্রেমিক খুব বইটই পড়ে বলে সে তথ্য দিলো আমাকে। আরো বললো, লেখকদের সে খুব পছন্দ করে। কেননা তারা হয় আর দশজন থেকে আলাদা। উদার তো বটেই। সে

কথা দিলো, বাজারে আমার বই পেলেই সে তার কৌতুকাভিনেতা প্রেমিকার জন্যে কিনবে এবং তাকে উপহার দেবে।
নেড কোনো ব্যাপারেই কোনোরকম ঢিলেমী সইতে পারেনা। সে দ্রুত চুমুকে গ্লবলেট শূন্য করেই ক্যানভাস আঁটসাট করতে শুরু করলো। টুলের ওপর এনে রাখলো রঙের প্যালেট আর একটা ক্যামেরা। শিল্পী হলেও বেশ গোছানো স্বভাবের মানুষ সে। সবকিছু গোছগাছ করে সে সটান এসে দাঁড়ালো ওদের দু'জনের সামনে। মেয়েটাকে হাত ইশারায় উঠতে বললো। আমিও উঠবো কিনা—এই রকম ভেবে জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাতেই নেড বলে উঠলো—উঠতে হবে তোমাকেও। তবে এক্ষুনি নয়। আপাততঃ ওইখানেই লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বসে বসে তুমি নুড আঁকা দেখবে। দেখেছো কি, এর আগে? যাই হোক একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাও এই ফাঁকে। কিন্তু আসল কাজ হবে পরে। তাতে অংশ নিতে হবে তোমাকেও। এখন তুমি নেডের নুড আঁকা ছাখো মুড নিয়ে। হাঃ হাঃ হা।' বলে মেয়েটির দিকে চেয়ে মাথাটা ঝাঁকানি দিলো।
মেয়েটি তার সোনার তারের মতো চুলগুলোকে ক্লিপের বাঁধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে ইজেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পর একটা একটা করে পোষাক খুলতে লাগলো অভ্যস্ত ভঙ্গীতে। সবগুলো পোশাক কার্পেটের ওপর রেখে সে যখন লীলায়িত দেহে ঘুরে দাঁড়ালো—শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো

আমার। এমন নিখুঁত নিতম্ব কি করে হয়, আমার মাথায় এলোনা। সাধারণ মাপের চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু। দুটি গোলাপী রাবারে পর্বতের মাঝখানে অন্ধকার সরু গিরিখাত। ওখানে সামান্য একটু স্পর্শ করলেই যেন আগুন জ্বলে উঠবে। উঁরু এবং গোড়ালীর গড়ন দুর্দান্ত। আগে যা ধারনাও করা যায়নি।

ওর শরীরের একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো সারাটা কক্ষে। নেড উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'বাঃ বেব্বি বাঃ। এবার একটু ঘুরে দাঁড়াও না সুন্দরী। অতো শরম কিসের। মস্ত বড়ো একজন লেখকের সামনে ন্যাংটো হয়েছো আজ তুমি। এতো গর্বের কথা।' বলতে বলতে সুইং ডোরের মতো সে ঘুরিয়ে ধরলো মেয়েটাকে। পাছার তুলনায় স্তনযুগল নাতিবৃহৎ। কিন্তু তলপেটটা ঠিক মরুদ্যানের শান্ত সবুজ চাতালের মতোই। যেখানে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে চাঁদে পাওয়া লেমিং হরিণেরা। চিয়াস্তির নেশায় মেয়েটার চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু। সে অল্প অল্প দুলছিলো। নেড ওর একটা পা ছোট টুলের ওপর রেখে, কোমর বেঁকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলো, কীভাবে পোজ দিতে হবে। মেয়েটি হাসলো। তারপর গিয়ে দাঁড়ালো নেডের দেখিয়ে দেওয়া ভঙ্গীতে। রক্তের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেছে আমার। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান দুটো। মনে হচ্ছিলো, হয় এক লাফে উঠে গিয়ে সোনালী চুলের মেয়েটাকে ঝাপটে ধরি অথবা

স্টুডিওর দরজা খুলে সবেগে রাস্তায় গিয়ে নামি। কিন্তু নেড কেমন আশ্চর্য রকম নির্বিকার। সে ক্যানভাসের ওপর সাঁৎ সাঁৎ তুলি চালাচ্ছে। ম্যাজিকের মতো ফুটে উঠছে নগ্ন শরীরের আউট লাইন। হুবহু ওই মেয়েটা। মেয়েটাকে নানাভাবে বসিয়ে, দাঁড় করিয়ে, শুইয়ে ছবি আঁকতে লাগলো নেড ক্যাপার মতো। যেন ওর কোনো হিতাহিত জ্ঞান নেই। যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে নেড অবিরাম টিপে চলেছিলো তার ক্যামেরার শার্টার। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এমন কায়দা আমি কখনো দেখিনি আগে।

ছবি আঁকা শেষ হলে নেড পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে গুঁজে দিলো মেয়েটার হাতে। মেয়েটা মুহূর্তের মধ্যে টাকাগুলো নিয়ে খুলে রাখা পোশাকের নীচে রাখা হাত ব্যাগের ভেতর রাখলো। যেন তার গুণে দেখার সময় নেই। অথবা জানাই আছে কতো টাকা আছে সেখানে। খুবই অভ্যস্ত এবং পরিচিত ভঙ্গী তার। নেড ক্যামেরাটা নিয়ে আলমারির ভেতরে আটকে রাখলো। তারপর নিচের তাক থেকে বের করে আনলো ড্রাই জিনের বোতল। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো মেয়েটার। সে ওপাশের ডিভানের ওপর আধ শোয়া অবস্থায় বোতলটার দিকে তাকালো তৃষ্ণার্তের মতো। আমার গলাটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো একেবারে। নেড ফস্ করে বোতল খুলে মদ ঢাললো

পবলেটে। পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে গিয়ে কোথেকে একটা লেবু নিয়ে এলো। চাবির রিংয়ের ভেতর থেকে কায়দা করে বের করে নিলো একটা চাকু। লেবুটাকে ফালা ফালা করে কেটে রস নিংড়ে ফেললো জিনের পাত্রে। তিনটে পেয়ালায় বরফও এনে দিলে তিন টুকরো। মেয়েটার পাশে গিয়ে বসলো সে তারপর। দু'হাতে দু'টো পবলেট। মেয়েটা স্তন জোড়া উদ্ভাসিত করে হাঁ করলো। তারপর নেডের হাত থেকে পাত্রটা নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো সবটুকু জিন। একটা মৃদু ঢেকুর উঠলো তার। তলপেটটা ঝাঁকি মেরে উঠলো একটু খানি। নেড ওখানে বসেই মেয়েটার স্তনের বোঁটায় চুমু দিলো। মেয়েটা কঁকিয়ে ওঠে চোখ মুঁদে। খানিকটা নেশা হয়েছে মনে হয়। নেড মেয়েটার নাভির ওপর চুমু খেলো আর একটা। আরো শব্দ করে কঁকিয়ে ওঠে রুগু মেয়েটা। সাদা আলোর নিচে সোনালী চুলগুলো ঝলমল করে ওঠে ওর। হঠাৎ নেডের প্যান্টের জিপ টেনে ফাঁক দিয়ে ডান হাতটা সাপের মতো ঢুকিয়ে দেয় সে। তারপর হ্যাঁচকা টানে বাইরে বের করে আনে ওর মোমবাতির মতো সাদা ও শক্ত শিশ্নটাকে। নেড সামলে ওঠার আগেই সেটি খপ্ করে মুখের মধ্যে পুরে প্রাণপণে চুষতে থাকে মেয়েটা। তার সারা শরীর কাঁপছে। যেন হিস্টিরিয়া রোগী। যেন আইসক্রিম খাচ্ছে সে মনের আনন্দে। একটা জান্তব আওয়াজও সে করছে থেকে থেকে। হিংস্র ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো। কিন্তু

মিনিট তিনেকের মধ্যে কাতর আনন্দময় শব্দ করে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়লো নেড। মেয়েটা তখনো মুঠোয় ধরে আছে নেডের নুনু। এবং নুসুটার মুখ থেকে অগ্নেয়গিরির লাভার মতো সাদা আঠালো বীর্যের স্রোত উৎক্ষিপ্ত হয়েছে শূন্যে। মেয়েটা হাঁ করে সেই বীর্য খেতে লাগলো ক্ষুধার্তের মতো। যেন কতোকাল অনাহারে থাকবার পর সে প্রাণ ভরে অমৃত পান করছে।

দৃশ্যটায় বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি। যৌনতার ব্যাপারে নেড আমার কাছে নেহাৎ নাবালক। কামকলার অ আ ক খ ও সে শেখেনি এ পর্যন্ত। নইলে নুড এঁকে এবং একই সঙ্গে সেই অবয়বকে ক্যামেরা-বন্দী করে যে যৌনাচরণ সে শুরু করেছিলো, তাতে মুন্সিয়ানার লক্ষণ থাকলেও, এক ক্ষণস্থায়ী নাবিশীর ছাপ দেখলাম আমি। অবশ্য মেয়েটা সাড়া দেবার ব্যাপারে বেশ গ্রহণযোগ্য। ঠাণ্ডা পাথরকে তাতিয়ে তোলার ক্ষমতা সে রাখে। কিন্তু নেড— একেবারে আনাড়ী। আদেখলেও বলা চলে তাকে। নইলে এমন রাজসিক আয়োজনের এক দুর্লভ আগুনে এমন করে কেউ পানি ঢেলে দেয়?

নেড উঠে বসে প্যান্টের জিপ ফাস্‌নার টেনে দিয়েছে। মেয়েটাকে ডিভানের ওপর উপুড় করে শুইয়ে পাছার ওপর আলতোভাবে কামড় দিলো সে। মেয়েটা কপট আর্তনাদ করে উঠলো কুকুরীর মতো। তারপর নেডের শুকনো গালে সশব্দে চুমো খেলো। নেড চোখ-ইশারায় ডাক দিয়েছে আমাকে।

কিন্তু আমি যেন হঠাৎ কেমন শিটিয়ে গেছি। আমার সামনেই সাজানো আছে ইজেল। ইজেলের পেছনে জানালা। কাচের সার্সির ওপর দিয়ে কালচে-লাল পর্দাটা সরে আছে এক পাশে। হঠাৎ সেই ফাঁকে একটা মুখ যেন দেখেছি আমি বিছুচ্চমকের মতোই। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার সেই মুখটা মনে হলো যেন মোনার। জানালার ওপারে রাস্তা। লোকজনের চলাচল আছেই। সেখানে মোনা এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেকি? সারা শরীর ঘেমে উঠলো আমার। ভেতরের কাণ্ডকারখানা দেখতে পেয়েছে কি মোনা? কিন্তু মোনা ওখানে কেন আসবে?

হতভম্বের মতো বসে ছিলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম না, এখন আমার করনীয় কি? জানালার পর্দাটা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখবো? নাকি বাইরে গিয়ে দেখে আসবো ঘটনাটা কি? নেড আমার হাবভাব দেখে চিন্তিত মুখে উঠে এলো।

'কী হলো হেনরী। তোমার ভালো লাগছে না?'

'না না— এ কিছু নয়, খুব ভালো লাগছে। চমৎকার এই মেয়েটা।

'আপনার মুখ দেখে কিন্তু উল্টোটাই মনে হয় মিস্টার, রাইটার।'

'ও, মুখ গোমরা করে রেখেছি বুঝি আমি। আমার মুখটাই কিন্তু এরকম।' আমতা আমতা করে বললাম আমি। পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে হ্যামলেটের একটি বিখ্যাত

ডায়ালগ আওড়াতে যাবো—হঠাৎ জানালার দিকে চোখ গেলো আমার। পর্দার ফাঁকে আবার সেই মুখ। এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না আমি। ছুটে গেলাম জানালার কাছে। কিন্তু পর্দা সরিয়ে কাচের সার্সির আড়ালে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে নিজেকে নির্বোধ না ভেবে উপায় নেই। দু'তিনটি মেয়ে বার্লেস্কের গেটের দিকে তাকিয়ে পপ কর্ণ খাচ্ছে আর গল্পসল্প করছে। একটি মেয়ের মাথার টুপিটাই কেবল সোনার টুপির মতো। আর সেই টুপিটাকে দেখেই আমি আঁৎকে উঠেছিলাম।

'মালগুলোকে চেনো নাকি হেনরী?' জিজ্ঞেস করে নেড।

'মুখচিনি। কিন্তু নাম টাম জানি না। ওই ছাই রঙা হ্যাট পরা মেয়েটাকে চেনো নাকি তুমি?'

'কেন বলোতো মনে ধরেছে বুঝি! এই সোনাচুলো মাগিটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না!'

'আরে না না। আমি অন্য একটা জিনিস দেখছিলাম ওই টুপি পরা মেয়েটা তোমার ষ্টুডিওর ভেতর উঁকিঝুঁকি মারছিলো।'

'ও তো রীটা। মাথায় ছিট আছে। কিন্তু খাসা চীজ। লাগাবে নাকি, একদিন। ও প্রায়ই আসে স্টুডিওতে। উঁকি মারার বদভ্যাসও আছে।'

'ধেৎ!' আমি ধমকে উঠলাম। নেড আসলে একটা অপদার্থ। মওজ লুটতে বসে এক রমনীর সামনে আর এক রমনীর প্রশংসা

করে কোন্ আহম্মক ? অনেকটা সেই ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেবার জন্যেই আমি মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলাম। মেয়েটা মুখ গম্ভীর করে আধ শোয়া হয়ে বসেই আছে ডিভানের ওপর। আমি পাশে গিয়ে বসতেই মুখখানায় আলো ফিরে এলো ওর। একটু ঘুরে বসলো। ফলে ওর সুচালো স্তনের নরম ধাক্কা লাগলো আমার উরুর ওপর। গরম হয়ে উঠলো শরীরটা। আমি ওর একটা হাত তুলে নিলাম আমার কোলের ওপর। হাতের আঙুলগুলোও ওর সুন্দর। নখের হালকা গোলাপী পালিশ যেন ওর গায়ের রঙের সঙ্গেই মিশে আছে। ওর মুখটার চারদিকে নোংরা লেগে আছে। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে দিলাম ওর। তারপর হাত রাখলাম তলপেটের ওপর। বলতে গেলে ওর তল পেটটাই আমাকে মারাত্মকভাবে টানছিলো প্রথম থেকেই। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই যে, নেড ওর নাভিতে চুমু দিলেও একবারও কেন তল পেটের ওপর হাত রাখলো না কিংবা সেখানে আঙুল বুলিয়ে দিলোনা। যাহোক, আমি ডিভানে বসে আমার উরুর ওপর মেয়েটার স্তনের স্পর্শ অটুট রেখেই ডান হাত ঘুরিয়ে রাখলাম ওর নাভির নিচে। শিউরে উঠলো মেয়েটা। একটা অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেলো যেনো ওর অন্তস্থলের ভেতর। আমি ওকে কোলে এনে বসালাম। তারপর উপুড় করে শোয়ালাম আমার দুই উরুর ওপর আড়াআড়িভাবে। ওর তলপেটটা থাকলো আমার শিস্নের ঠিক ওপরেই।

আর কি চাই? আমি পরম তৃপ্তিতে দু'চোখ বুজে যেন জীবন্ত শবের আরাধনায় নিমগ্ন হলাম।

নেড কার্পেটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে জিরোচ্ছে। ঘাড় বাঁকা করে সে আমাদের লক্ষ্য করছিলো থেকে থেকে। তার মুখটা বেশ খুশি খুশি। যেন মাছ যে এবার টোপ গিলবে, সে ব্যাপারে বর্শেল নিশ্চিত। একবার আমাদের দিকে আর একবার ইজেলের স্কেচের দিকে তাকিয়ে ফুর্তিতে শিস দিয়ে তুড়ি বাজাতে লাগলো ভবিষ্যতের আর্ট ডিরেক্টর। জানালার বাইরে মেয়েগুলোর নড়াচড়া এখন আর চোখে পড়ে না। আমি প্যান্টের হিপ পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে মেয়েটার হাতে দিলাম। এবার কিন্তু টাকা নেবার ব্যাপারে ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখালো না সে। বরং ডালারগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। আমি তখন ওর চোখের সামনে থেকে টাকাগুলো সরিয়ে এনে পরম স্নেহে মেয়েটির তুলতুলে পাছার ওপর চুমু খেলাম। উষ্ণ, মসৃন বিচিত্র ঘ্রানময় নিতম্বটি যেন ঈষৎ কেঁপে উঠলো। আমি আবার চুমু দিলাম। একই জায়গায়, অন্য পাশে। আবার আমার উরুর ওপর ওর শরীরের মৃদু ঝাঁকানি অনুভব করলাম আমি আশ্চর্য, এই কম বয়েসী কুত্তীটার দেহমন এখনও অসাড়, গতানুগতিক ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি। এখনো শিহরণ জাগে এই দেহে। হাতের সীমার মধ্যেই স্কার্টের নিচে ওর হাতব্যাগটা। আমি ডলারগুলো রেখে দিলাম সেই হ্যাণ্ড ব্যাগের

মধ্যে। ম্যাকফারল্যাণ্ড বেশ কিছু টাকা আগাম দিয়েছেন। পুরো টাকা মোনার হাতে তুলে দেবার পর মোনা আমাকে যা দিয়েছে, তার সব ক'টাই ছিলো আমার প্যাণ্টের পকেটে। পুরো টাকাই দিয়ে দিলাম মেয়েটাকে। ও আজ আমাদের যা দিয়েছে তার তুলনায় কিছুই নয়। ফেরার সময় রাস্তা খরচাটা নেডের কাছ থেকে দিব্যি চেয়ে নেয়া যাবে।

ব্রণ্ড মেয়েটা হঠাৎ উঠে বসে গলা জড়িয়ে ধরলো আমার। পরপর দু'তিনটে চুমু খেলো আমার দুগালে। তারপর আমাকেই তুলে নিয়ে বসালো ওর কোলের ওপর। মিনিট খানেক বোকার মতো থেকে আমি নেমে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুষ্টু মেয়েটা আমায় প্যাণ্ট খুলে ফেলেছে ত্রস্ত হাতে। এবং আমি বাধা দেবার চেষ্টা করার আগেই সে মুখোমুখি বসে আমার লৌহ দণ্ডের মতো টান টান পুরুষাঙ্গটি ঢুকিয়ে দিলো নিজের দপ্ দপ্ করতে থাকা যোনীর মধ্যে। চুম্বকে যেমন আলপিন টানে, ঠিক সেইভাবে আমার লম্ফমান নুনুটি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো এক উষ্ণ অন্ধকার ও পিচ্ছিল রন্ধ্রের ভেতর। সত্যি বলতে কি কয়েক মিনিট আমার কোনো চেতনাই যেন ছিলোনা। নিজেকে ফিরে পেলাম স্বর্গীয় সঙ্গীতময় রামধনুরঙ এক অলৌকিক প্রকোষ্টে কোনো উলঙ্গ পরীর সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায়। সঙ্গম মাত্রই সুখদ হয়না। রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বড়োই রহস্যময়। আমি নিশ্চয়ই আমার জীবনে এই সময়টুকু পর্যন্ত অনুমানিক পনেরো হাজার বার নারীসঙ্গে

লিপ্ত হয়েছি। কে যেন বলেছিলো, একটি মানুষ তার জীবনে ত্রিশ হাজার বারের বেশি বার রমন করতে পারেনা। আমি, তাহলে আছি মাঝামাঝি পর্যায়ে। বহু বিস্ময়কর সঙ্গমের স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার তৃষ্ণার্ত শিশ্নে। বহু আনন্দ এবং বেদনাবহ ঘটনার ছাপ। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা কেমন যেন অন্য রকম। কেমন স্বপ্নসুলভ, কীরকম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। সঙ্গমে এতো গভীর পুলক কবে পেয়েছি স্মরণে আসেনা। আধঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেছে জানিনা। এর মধ্যে তিন-বার বীর্যস্খলন হয়ে গেছে আমার। মেয়েটাও খুব সম্ভব দু'বারের কম শীৎকার করে ওঠেনি চরম পুলকে। কিন্তু আমা-দের উভয়ের ক্ষুধাই যেন আজ সর্বগ্রাসী! আমরা ব্যাত্যা-তাড়িত তরণীর মতো ওলট পালট হতে হতে কখন যে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়েছি, জানিনা। চমক ভাঙ্গলো, নেভের দিকে চোখ পড়তে। আশ্চর্য ব্যাপার! চোখের ওপর এমন আদিম লীলা দেখতে দেখতে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারে, তা বিশ্বাস করতে বাস্তবিক কষ্ট হচ্ছিলো আমার।

৪

মানুষ ভাবে এক হয় আর !

আমাদের সবকিছুই যে ওলট পালট হয়ে যাবে এবং আমাদের কোনো পরিকল্পনাই যে বাস্তবায়িত হবে না, 'তা তো খুবই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে তিনবার বাসা বদল করেছি আমরা। আমাদের আয় বাড়লেও বাসার মান ক্রমশ নেমে এসেছে। ঘুঘুর বাসার স্বপ্ন এখন স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

আমরা বর্তমানে যে বাসায় আছি, সত্যি কথা বলতে গেলে, তাকে একটা প্রাইভেট ক্লাব বলে উল্লেখ করা যায় অনায়াসে প্রাইভেট ক্লাব এবং চিত্তবিনোদন কেন্দ্র বললে ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হয়। রান্নাঘরের দেয়ালে পর পর কয়েকটি নাম লেখা আছে চক দিয়ে। তাতে কে কতো টাকা দেবে সেই অঙ্কটি পাশাপাশি লেখা। নামগুলো কেবল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের।

ইতিমধ্যে অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে আমরা হারিয়েছি। আবার পেয়েছিও অনেককে। রবার্টো আর জর্জ ইনেস এদেরই দু'জন। এরা দু'জন আত্মগোপন করার জন্যেই খুব

সম্ভব এক একদিন দুপুরে আসে আমাদের এখানে। ওরা না-এলে আসে ও মারা আর নেড। আমরা পেছনের ঘরের জানালার পাশে বসে দাবা খেলি। মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মক্কেল ম্যাথিয়াসের। কোনো কোনো দিন বিশেষ কারণে আসে রদারমেল। সে আসে সাধারণত বিকেলের দিকে। থাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা। মোনার সঙ্গে আলাপ করে নিভৃতে। যাবার সময় তার হাতে দিয়ে যায় দশ থেকে কুড়ি ডলার।

যে রাতে বাইরে আমাদের কোনো কাজ থাকেনা, আমরা পেয়িং কাস্টমারদের তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিই। তারপর দু'টেবিল একত্রে করে পিং পং খেলি। মাঝে মধ্যে আয়োজন করি প্রতিযোগিতার। ফলাফল নির্ধারিত হবার পর বিয়ার, জিন অথবা ওয়াইনের ফোয়ারা ছোটে।

সবকিছুই চলছিলো বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই। কিন্তু টনি মরার যেদিন খুব সুন্দরী মডেলটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো, গণ্ডগোলের সূত্রপাত সেদিন থেকেই। রদারমেল খুব ঝগড়াটে প্রকৃতির। টনির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে যখন তখন। মোনার মতো, নবাগত ওই মডেলটিকেও খুব সম্ভব সে কুক্ষিগত করতে চায়। একদিন যা তা গালিগালাজ শুরু করলো সে আমাকে। আমি বললাম, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। রদারমেল বললো, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবার কে?'

'আমি এ বাসার ভাড়াটে।'

'এঃ, ভাড়াটে।' থুথু ফেললো রদারমেল। আমি ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু ও আমার চেয়ে শক্তিশালী। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের মতো। অবশ্য সবাই এসে ওকে ধরে ফেলেছে হয়তো পরক্ষণেই। বাধা দিয়েছে। আমি ভীষণ রেগে বলে উঠলাম, 'সবাইকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবো আমি।'

'প্লিজ উত্তেজিত হবেন না।' টনি মরার যোঝায় আমাকে। 'এমন চমৎকার আড্ডাটা ভেঙ্গে দেবেন না দয়া করে। এরকমটি যাতে আর না-হয় আমি নিজে তা দেখবো। ব্যাপার কি জানেন, ও আমাকে দ্যাখে একটা হুনের মতোই। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। একটু পান করুন। আপনি কেন জড়াতে যাবেন এসব উট্‌কো ঝামেলায় ?'

কিন্তু রদারমেলের গলা ক্রমশ চড়ছে। আমি বিরক্ত হয়ে ও'মারা আর নেডকে ইশারায় বোঝালাম, লোকটাকে চুপ করাও।

হঠাৎ আমার কানে এলো রদারমেলের চিৎকার, 'মোনা, মোনা—। কোথায় গেলো কুত্তীটা ? আমি এক্ষুণি ওর ইয়েতে আমার ইয়ে ঢুকিয়ে দেবো। যীশুর নামে শপথ করে বলছি আমি।'

'ওকে আমি এক্ষুণি এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাই।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম।

'নিশ্চয়ই দেবেন।' সমস্বরে বলে উঠলো সমবেত সাঙ্গাই।

'একটা ক্যাব ডেকে এক্ষুণি ওতে তুলে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া যাক।' তারা পরামর্শ দিলো। 'বাজে লোক একটা!' গজ গজ করলো কে যেন।

শেষে নেড, ও'মারা আর আমি রদারমেলের ওভার কোটের কলার ধরে ওকে রাস্তায় নিয়ে ফেললাম। লোকটা এত মদ গিলেছে যে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই। হট্টগোলের মধ্যে পড়ে মাথার টুপিটা হারিয়ে ফেলেছে কোথায়। নেড ট্যাক্সি ডাকতে গেলো। ও'মারা আর আমি রদারমেলকে ধরে রইলাম। যা তা গালাগালি করলাম। মুখ ভ্যাংচালাম। ভাগ্যিস রাস্তাটা ছিলো জনশূন্য। রদারমেল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। টলতে টলতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো পাশের নর্দমায়। আমরা ওকে ধরাধরি করে দাঁড় করলাম। তারপর তুলে দিলাম একটা ক্যাবে।

বাসায় ফিরে এলে খুশিতে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। 'খুব উচিত কাজ হয়েছে। ব্যাটাকে পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া উচিত।' আড্ডা ফের জমজমাট হয়ে উঠলো। মদ আর স্যাণ্ডউইচের ছড়াছড়ি। টাক মাথা এক রাজনৈতিক নেতা বললেন, 'ওই লোকটা যদি আবার এখানে এসে প্যাঁজাম করে, আমায় খবর দেবেন।' পকেট থেকে নিজের নাম লেখা একখানা কার্ড বের করে ওর হাতে দিলেন রাজনৈতিক নেতা। স্কচের পর স্কচ আসতে লাগলো। খুব উঁচু মানের হুইস্কি। ঢক ঢক করে সবাই আকণ্ঠ পান করতে লাগলো

সেই ঘোড়ার মুত। অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়।

মাতালগুলো চলে যাবার পর আর্থার রেমণ্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলো কয়েকটা অল্পবয়েসী ছেলের সঙ্গে। ছেলেগুলোকে এর আগে আমি দেখিনি। শোনা গেলো, ছোকরাগুলো নাকি মোনাকে অপমান করেছিলো। যে ছেলেটা পালের গোদা—তার নাম ডাকি। ছেলেটা বেশ সুদর্শন। যদিও এই পরিবেশে বয়সজনিত কারণে সে বেমানান। 'ওকে সবার সামনে মাফ চাইতে হবে।' বললো আর্থার রেমণ্ড। ডাকি ভাবলো এটা মস্ত রসিকতা। আর্থার এই উপেক্ষা সহ্য করতে পারলো না। ডাকিকে জাপটে ধরে মেঝেয় আছড়ে ফেললো। তারপর উঠে বসলো ছেলেটার বুকের ওপর। জোরে জোরে মেঝের ওপর ঠুকতে থাকলো ওর মাথা। 'আরো এরকম কাজ করবি? বল্, আরো করবি এমন কাজ?' বারবার গর্জে উঠতে লাগলো আর্থার রেমণ্ড। মারের চোটে ডাকি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলো শেষ অব্দি। আর্থার রেমণ্ড আস্তে আস্তে ওকে টেনে তুললো। ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেমন যেন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে আর্থার রেমণ্ড। ডাকি ওর কোট আর হ্যাট তুলে নিলো---বিল টিল যা ছিলো, শোধ করলো এবং একটিও কথা না বলে চলে গেলো। রেমণ্ড নিজের টেবিলে বসে রইলো মাথা নিচু করে। তাকে খুব লজ্জিত মনে হচ্ছিলো। কয়েক মিনিট পরে সে-ও উঠে দাঁড়ালো এবং বাইরে চলে গেলো।

কয়েক দিন পর রেমণ্ড এলে ওকে দেখে চমকে উঠলাম আমরা। চোখে মুখে অনেকগুলো আঘাতের দাগ। শোনো গেলো, ডাফি সেদিন এখান থেকে বেরিয়ে বাইরে কোথাও ঘাপটি মেরে ছিলো। রেমণ্ডকে আচ্ছা মতো ধোলাই দিয়েছে সে। তার মানে শোধ বোধ। ঘটনাটা আর্থার রেমণ্ডকে খুশি করেছে বলেই মনে হয়। এবং এটাও অনুমিত হলো যে, ডাফির সঙ্গে রীতিমতো ভাব হয়ে গেছে ওর। যাহোক, জীবনে এবারই নাকি প্রথম মার খেলো সে।

'আশা করি, এর পর থেকে নিজের চরকাতেই তেল দেবে—' মোনা বললো, 'অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না।'

আর্থার রেমণ্ড কোনো রকম জবাব দিলো না।

'তা, তুমি তোমার বিলগুলো শোধ করছো কবে?' মোনা জিজ্ঞেস করলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আর্থার রেমণ্ড বলে উঠলো, 'কতো টাকা পাও আমার কাছে?' বলতে বলতে পকেটে হাত দিয়ে এক তাড়া নোট বের করে আনলো সে। গুণে গুণে বিল শোধ করে দিলো। বললো, 'তোমরা নিশ্চয়ই এটা আশা করোনি। তাই না?' লড়াকু মোরগের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো সে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গট্ গট্ করে হেঁটে গেলো রান্না ঘরে। দেয়ালে লেখা বাকির লিস্ট থেকে মুছে ফেললো নিজের নাম।

'তোমাদের জন্যে আমার তরফ থেকে আরো একটা সারপ্রাইজ

আছে।' আর্থার রেমণ্ড বললো। তারপর উপস্থিত সবার জন্য ড্রিংকস সার্ভ করতে বললো, 'আজ থেকে একমাস পর্যন্ত আমি একটা কনসার্টের আয়োজন করতে যাচ্ছি। সেখানে পরিবেশিত হবে বাখ, বিঠোফেন, মোৎসর্ট, র‍্যাভেল, প্রকোফিয়েফ আর স্ত্রাভিনস্কির সঙ্গীতে। তোমাদের সবাইকে সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি। তোমাদের সামনে এটাকেই আমার শেষ উপস্থিতি বলতে পারো। এর পরেই আমি কমুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগ করবো। আমার যন্ত্রের হাত কি হবে কিংবা হবে না, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। আমি এই জীবন পরিত্যাগ করছি। এবার থেকে যা কিছু করবো সবটাই হবে গঠনমূলক। হ্যাঁ, স্যার!' তারপর টেবিলের ওপর তাল ঠুকে বললো, 'আজ থেকে তোমাদের সবার সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো আমার।'

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালো সে। বললো, 'কনসার্টের কথাটা কিন্তু ভুলো না। আমি সামনের দিকে সীট রাখবো তোমাদের জন্যে।'

আর্থার রেমণ্ডের ঘোষণার পর থেকেই আমাদের সামগ্রিক অবস্থার ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করতে লাগলাম। তাবৎ পাওনাদাররা এসে ঘিরে ফেললো আমাদের। আর কেবল পাওনাদাররাই নয়, পুলিশ এবং উকিলরাও। মদে তার প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্যে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ তাদের।

বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটালো বরফঅলা। সে ভোরবেলা এসে ক্রুদ্ধ হাতে কড়া নাড়তে লাগলো দরজায়। আমরা তাকে ঠেকালাম গভীর ঘুমের ভান করে। অথবা সে মনে করে নিক, আমরা বাসায় নেই। দুপুরে জানালার বাইরে দেখা গেলো মুদী দোকানদার, রেস্তোরাঁ-মালিক, মদ-সরবরাহকারীদের হাঁটাহাঁটি। সন্ধ্যায় দেখা দিলো আরো কিছু খুচরো এবং অনিয়মিত পাওনাদার। সবশেষে কড়া তাগাদা লাগালো বাড়িঅলা। হুমকি দিলো, বাকিপড়া বাড়িভাড়া পুরো মিটিয়ে না-দিলে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে সে। কোনো কোনো সময় বিরক্তি এমন পর্যায়ে ওঠে যে আমরা জয়েন্ট বন্ধ করে দিয়ে সোজা সিনেমা দেখতে চলে যাই।

একদিন রাত্রে আমাদের এখানে উদয় হলো তিন মূর্তি। তিনজনই আমাদের পুরনো দোস্ত। ওসিয়েকি, ও'শনেসি আর অ্যাণ্ড্রুজ। সঙ্গে 'কলিজ' থেকে নিয়ে আসা তিনটি মেয়ে। সময়টা হবে মধ্যরাতের কাছাকাছি। আর সব ক'টাই দুলছে সমুদ্রগামী জাহাজের মতো। রাতটা ছিলো সেইসব রাতেরই একটা, যখন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কলিজের মেয়েগুলো খুবই সুন্দরী, পল্‌কা আর অসম্ভব রকমের সুলরুচির। তারা বললো টেবিলগুলোকে গায়ে গায়ে লাগাতে। যাতে তার ওপরে উঠে তারা নাচতে। পারে। পারে হাসিতে ফেটে পড়তে বা ওইরকম আরো যা কিছু আছে তার সবকিছু করতে। ওসিয়েকি, যে নাকি

নিজেকে কশাক ভাবতে ভালোবাসে, সে শুরু করলো নানা রকম শারীরিক কসরৎ। বেশ কিছু কাপ ডিশ আর চেয়ার ভাঙবার পর হঠাৎ করেই ঠিক হলো যে সাবাই মিলে হার্লেমে যাওয়া যাক। যে কথা সেই কাজ। মোনা, ওসিয়েকি আর আমি একটা ক্যাবে উঠে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে স্পাড জ্যাসন আর তার আলামেডা, যার কোলে ফিফি নামে এক কুকুর ছানা। আমরা হার্লেমে যখন পৌঁছলাম, ততোক্ষণে বাচ্চাটা পেচ্ছাব করে সাবার কাপড় ভিজিয়েছে। হঠাৎ উত্তেজনায় মুতে ফেললো আলামেডা নিজেই।

হার্লেমের 'স্মল্‌স' তখনো গম গম করছে। আমরা সবাই সেখানে শ্যাম্পেন খেলাম। নিগ্রোদের সঙ্গে নাচলাম। সেই সঙ্গে রসুন সহ শিক কাবাব খেলাম প্রচুর পরিমানে। ডাক্তার ক্রনস্কিকেও খুব উল্লসিতভাবে উপভোগ করতে দেখা গেলো এই পান ভোজনের আসর। কে যে এই বিপুল পরিমান খাদ্য আর পানীয়ের দাম মেটালো আমি জানিনা। মনে হলো, অসিয়েকিই দিলো। যাহোক, সূর্য যখন উঠছে আমরা সেই সময়ে বাসায় ফিরে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর এলিয়ে দিলাম বিছানায়। আমরা কেবলি ঘুমিয়েছি, অ্যালান ক্রমওয়েল জানালায় এসে টোকা দিতে শুরু করলো। সে ভেতরে আসতে চায়। আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরই সে একজন। কিন্তু আমরা তার দিকে মনোযোগ দিলাম না মোটেই। 'আমি অ্যালান, অ্যালান!' সে বারবার চ্যাঁচাতে লাগলো,

'ভেতরে আসবো। দরজাটা খুলে দাও।' অ্যালান ক্রমওয়েল এমন ভাবে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেন সে কাঁদছে। অবশেষে বিচিত্র উপায়ে জানালা খুলে ভেতরে আসবার চেষ্টা করতেই সে পাকড়াও হলো পুলিশের হাতে। পুলিশটা ওকে ধরে খানিকটা দূরে নিয়েই পাছার ওপর বেশ কয়েক ঘা বেত মারলো। ক্রনস্কি আর ও'মারা ঘুমোচ্ছিলো টেবিলের ওপর। তারা একে বিশুদ্ধ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি। মোনা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো অবশ্য। সে যাই হোক, পরক্ষণেই আমরা গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেলাম আবার।

পরদিন নেড, ও'মারা আর আমি ফন্দি বের করলাম একটা। আমরা ঠাঁই নিলাম রান্নাঘরে। কথাবার্তা বলতে লাগলাম নিচু গলায়। কখনো ফিস ফিস করে। কাস্টমারদের দেখা শোনা করতে লাগলো মোনা। সময়টা ফ্লোরিডা-বুমের। ও'মারা সব সময় আমাকে উস্কানি দিচ্ছে এই বলে যে, সময় নষ্ট না-করে আমাদের মায়ামী চলে যাওয়া উচিত। আমরা মানে আমি, ও'মারা আর নেড। ও'মারার বিশ্বাস, ওখানে যে পরিমান টাকা হাওয়ায় উড়ছে, তাতে অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা বিপুল অর্থ উপার্জন করে মোনার কাছে পাঠাতে পারি। শুরু করে দিতে পারি নতুন জীবন। রিয়াল এস্টেট ব্যবসা শুরু করার সঙ্গতি আমাদের নেই, একথা ঠিক। কিন্তু যাদের সে সঙ্গতি আছে, তাদের কাছ থেকে পয়সা বের করে নিতে অসুবিধে কোথায়! যে কোনো রকম কাজ করবো

আমরা। ওয়েটার থেকে শুরু করে বেল-হপ্ পর্যন্ত। জুতো পালিশ করলেই বা ক্ষতি কি? পোড়াতে যে কোনো ধরনের কাজ করার জন্যে তৈরী আমরা। আবহাওয়া মনে হচ্ছে চমৎকার। আমরা যতোই দক্ষিণে যাবো—তা আরো বেশী চমৎকার হতে থাকবে।

ও'মারা খুব ভালোভাবেই জানে, প্রলোভন কতোটা আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

মোনা যে এধরনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করবে, তা আমি আগেই জানতাম। আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হলো, প্রতি রাত্রে টেলিফোনে কথা বলবো ওর সঙ্গে। তা, আমরা যেখানেই থাকিনা কেন? দরকার হবে কেবল খুচরো পয়সার, যা ফেলতে হবে স্লটের ফুটোয়। খচরা যতোই হোক না কেন? ইতিমধ্যে টেলিফোন বিল এতো বেড়ে যাবে যে কথাবার্তা বলার সুবিধের জন্যে টেলিফোন বাদ দিয়ে খোদ মোনাকেই আমাদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে।

সবকিছু প্রায় ঠিক। হঠাৎ বাদ সাধলো বাড়িঅলা। মায়ামীতে রওনা হবার দু'দিন আগে লোকটা কঠিন ভাষায় তাগাদা লাগালো। বেকায়দায় পড়ে আমি ভাবলাম, যেভাবেই হোক, বকেয়া ভাড়ার অন্ততঃ কিছুটা অংশ দিতেই হবে বাড়িঅলাকে। কিন্তু টাকার যোগাড় কিভাবে হবে, মাথায় এলো না। মনে পড়লো বাবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছেলের কথা। ছেলেটার খুবই অল্প বয়েস। কিন্তু এ বয়েসেই মস্তবড় স্টিমার-

সার্ভিসের ব্যবসা গড়ে তুলেছে সে। তার ওপর শরণাপন্ন হবার মতো কোনো কারণই ছিলো না আমার। যেন ডুবন্ত মানুষের খড়কুটা আঁকড়ে ধরার মতোই, আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম তার সামনে। তা, টাকার কথা শুনেই সে নিভে গেলো একেবারে। এমন কি ধৃষ্টতার সঙ্গেই জানতে চাইলো, এ ব্যাপারে তাকে কেন টার্গেট করা হয়েছে। আর কি কেউ ছিলোনা? তাছাড়া, সে তো কোনোদিন আমার কাছে কোনো রকম আনুকুল্য চায়নি? চেয়েছে কি? (ঝানু ব্যবসায়ীর মতো কথাবার্তা—এ লাইনে উন্নতি করবে নির্ঘাত)। আমি মুখ বুজে হজম করলাম সমস্ত অপমান। লাঞ্ছনার সর্বশেষ সীমায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে মাত্র দশটি ডলার বের করে দিলো সে। আমি একটা রসিদ লিখে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তাতে উৎসাহ দেখালো না। বাসায় ফিরে ক্ষোভে ঘৃণায় কান্না পেলো আমার। মনে হলো, বাসায় আগুন ধরিয়ে দিই। যাই হোক……

শনিবার বিকেলে ও-মারা এবং আমি বেরিয়ে পড়লাম মায়ামীর উদ্দেশ্যে। আর বিলম্ব করা চলে না। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া তা আর্দ্রও। তুষার কণায় ভরে উঠেছে চারপাশ। মৌসুমের প্রথম তুষারপাত। ঠিক হলো, এলিজাবেথের পেছন দিককার বড়ো সড়ক থেকে গাড়িতে চড়ে আমরা চলে যাবো ওয়াশিংটন। কেননা নেড বিশেষ কোনো কারণে সেখানে যাচ্ছে ট্রেনে চেপে।

এলিজাবেথের পেছন থেকে আমরা যখন গাড়িতে উঠলাম রীতিমতো সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কারের ভেতর ছিলো পাঁচটা কালো মানুষ। সব ক'টাই মদ খেয়েছে। কোন্ চুলোয় যাবার জন্যে এতো জোরে ওরা গাড়ি ছুটিয়েছে বুঝতে পারলাম না। অল্পক্ষণের ভেতর খোলসা হলো ব্যাপারটা। গাড়িটা মাদকদ্রব্যে ভর্তি। এবং পুলিশ তাদের পেছনে লেগেছে। গাড়ি থামিয়ে আমাদের ওরা কেন তুলে নিলো, আমরা তা অনুমান করতে পারলাম না। যখন ফিলাডেলফিয়ার দিকে গাড়ির গতি হ্রাস করে ওরা আমাদের নামিয়ে দিলো, আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এর মধ্যে প্রবল তুষারপাত শুরু হয়েছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে হাড়-কনকনে। তার ওপর চারদিকে পিচকালো অন্ধকার। ক'মাইল হাঁটতে হলো, হিসেব নেই। দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছিলো ঠক ঠক করে। হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মতোই পেয়ে গেলাম একটা পেট্রোল-পাম্প সেখান থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা পর আমরা অন্য একটা গাড়িতে লিফ্‌ট পেয়ে ওয়াশিংটন পৌঁছলাম।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টেলিফোন করলাম মোনাকে। রিসিভার ধরে থাকলো সে পনেরো মিনিট। অপারেটর বারবার সঙ্কেত দিচ্ছিলো যে বিল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যাহোক, মোনা কথা শেষ করলো একটা দুঃসংবাদ দিয়ে। আজকেই নাকি আদালতে উপস্থিত হতে হচ্ছে তাকে।

রিসিভারটা তুলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, এক্ষুণি

ফিরে যাই।

'আরে, অতো দুশ্চিন্তা কিসের?' ও-মারা বললো, 'তুমি কিচ্ছু ভেবোনা। মোনা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। একটা উপায় সে বের করে নেবেই যাহোক।'

আমি বেশ জানি, মোনা কতটুকু ঠাণ্ডা মেজাজের মেয়ে। কতোখানি ধীরস্থির। কিন্তু মন তো আর মানতে চায় না। ও-মারার সান্ত্বনায় সামান্যও হ্রাস পায়না আমার দুর্ভাবনা।

'কাল সকালেই রওনা হওয়া যাক,' আমি বললাম, 'চেষ্টা করলে তিন দিনের মধ্যে মায়াবী পৌঁছে যাবো আমরা।'

পরদিন দুপুর নাগাদ আমরা নেডের কাছে গেলাম। একটা পড়ো পড়ো হোটেলের জীর্ণ কামরায় দৈনিক এক ডলার ভাড়া দিয়ে উঠেছে নেড। তার ঘরটাকে দেখে গোর্কির 'নৈশ আশ্রয়ে'র চিত্রকলাই যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। প্রতিটি জানালাই ভাঙ্গা। কোনোটায় কাপড় এবং কোনোটায় খবরের কাগজ দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে পাল্লার ফাঁকগুলো। পানি বেরুবার নলগুলো বন্ধ। বিছানার গদির ছিবড়ে বেরিয়ে পড়েছে। স্প্রিংগুলো সম্পূর্ণ অকেজো। মাকড়শার জালে ছেয়ে আছে পুরো ঘরটাই। ধুলোর গন্ধটা এতো ভারি যে আমাদের প্রায় দমবন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের গৌরবময় রাজধানীর বুকে 'সাদা মানুষদের' জন্যে আবাসিক হোটেলের কী নিদারুণ নমুনা।

কিছু পনির, ওয়াইন, সালামি আর রুটি আনা হলো কিনে।

কেনা হলো কিছু জলপাইও। তারপর ব্রীজ পার হয়ে আমরা ভার্জিনিয়ায় ঢুকলাম। লাইন পেরিয়ে একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর উষ্ণ সূর্যের আলোয় সিগারেট ধরিয়ে গুণ গুণ করে গান গাইতে লাগলাম। গানটা আমাদের থীম-সঙ্। তার প্রতিপাদ্য হলো, আমরা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মুখের জন্য প্রতীক্ষা করছি।

নিজেদের পায়ের ওপর ভর দিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমরা প্রাণশক্তিতে বলীয়ান। দক্ষিণাঞ্চলটা কতো সুন্দর, কতো উষ্ণ। কতোই না আপন। যেন এসো এসো বলে স্বাগত জানাচ্ছে সবাইকে। আমরা যেন অন্য এক পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছি এখন। আসলে দক্ষিণাটা সত্যিই অতুলনীয়। এবং সব ব্যাপারেই। অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। সবচেয়ে এবং সবচেয়ে ভালো প্রেসিডেন্ট আমরা এখান থেকেই পেয়েছি।

ওয়াশিংটন থেকে রোয়ানোকে পৌঁছলাম যথেষ্ট ঝামেলার পর। আমদের তিন জনকে কোনো ড্রাইভারই তুলতে চায়না গাড়িতে। সংখ্যায় মাত্র তিনজন। দেখেই বোঝা যায়, আমরা ভবঘুরে উত্তুরে ভূত। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, তিনজন আলাদা হয়ে যাবো। আমরা ম্যাপের ওপর চোখ বুলিয়ে ঠিক করলাম, এরপর শার্লোটির ডাকঘরে আবার একত্রিত হবো সবাই। এই মতলবে বেশ কাজ হলো। আমরা আলাদা আলাদা ভাবে একে একে হাজির হলাম পোস্ট অফিসে।

শেষজন প্রথম জনের মাত্র আট ঘণ্টা পরে পেঁছলো গন্তব্য-স্থানে। এখানে আমরা পরিবর্তন করলাম পরিকল্পনা। নেড বললো, সে সরাসরি এখান থেকে মায়ামী পর্যন্ত পেঁছে যেতে পারবে। যে লোকটি তাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছে, সে মায়ামী অব্দিই যাবে। আমরা ঠিক করলাম, আমাদের পরবর্তি বিরতি হবে জ্যাকসনভিলে। ও'মারা আর আমি থাকলাম একসঙ্গে। নেড যাবে একা। পরদিন সকালেই সে কি বৃষ্টি। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়বে মাথার ওপর। শার্লোটির বাইরে ব্রেফ বড়ো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম আমরা দু'জন। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ভেজার পর মরিয়া হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে। এতে কাজ হলো। পরের গাড়িটাই আমাদের সামনে এসে ব্রেক কষলো সশব্দে।

'তোমাদের ব্যাপারটা কি বলো তো।' চেঁচিয়ে উঠলো ড্রাই-ভারটা।

'তুমি যাচ্ছো কোন্‌দিকে।' সমস্বরে চেঁচালাম আমরা।

'জাকসনভিল।'

দরজা খুলে যেতেই আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আমরা চুপ করে আছি। বেশ কয়েক মিনিট পর ড্রাইভার বললো, 'ভাগ্যিস, তোমাদের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিই নাই গাড়িটা।' আমরা কিছুই বললাম না। 'আমি বুঝতে পারছিলাম না' সে আমায় বলে উঠলো, 'তোমাদের গুলি করেই মারবো, নাকি চাকার নিচে পিষে ফেলবো?' ও মারার সঙ্গে চোখা-

চোখি করলাম আমি। 'তোমরা আসছো কোথা থেকে?' সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের হয়েছেটা কি? আমরা খুলে বললাম ঘটনাটা। লোকটা আমাদের কথা বিশ্বাস করছে বলেই মনে হলো। তারপর বিমর্ষভাবে সে আমাদের জানালো একটা দুঃসংবাদ। মাতাল অবস্থায় একটা বারের ভেতর ঝগড়া বাঁধলে লোকটা তার বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। একটা বোতল তুলে সে মেরেছিলো ওর মাথার ওপর। অবশ্য আত্মরক্ষার্থে। যাই হোক, ঘটনাস্থল থেকেই গাড়িতে ওঠে দ্রুত গতিতে ছুটে পালাচ্ছিলো সে। তার দুই পকেটে দু'টো রিভলভার। দুটোই গুলিভরা। রাস্তায় কোনো রকম বাঁধার মুখোমুখি হলেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবে সে। 'তোমার অল্পের জন্যে বেঁচে গেলে এ যাত্রা।' বললো লোকটা।

কিছুক্ষণ পর সে ফাঁস করলো যে আসলে টাম্পায় যাচ্ছে সে। নিরাপদে কিছুদিন আত্মগোপন করার মতো চমৎকার জায়গা নাকি ওটা। অন্তত এটা তার নিজের ধারনা। 'আমি হয়তো আবার ওখানে ফিরে যাবো এবং যা হয়, তার মোকাবেলা করবো।' লোকটা বললো, 'তার আগে আমার একটু ধাতস্থ হয়ে নেয়া দরকার। বারবার সে বলতে লাগলো, দোষটা আমার নয়। আমি কখখনো ওকে হত্যা করতে চাইনি।' বলতে বলতে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো সে। কাঁদতে লাগলো শিশুর মতো।

পথে যখন লাঞ্চ করার জন্যে থামলাম আমরা, ওই লোকটা বিল মেটাবার জন্যে পীড়াপিড়ি করতে লাগলো। ডিনারের

বিলও সে মেটালো। জর্জিয়ার ম্যাকনে একটা হোটেলে গিয়ে দু'শয্যার একখানা রুম নিলাম আমরা।

সে টাকাও ওই লোকটা দিয়ে দিলো। হোটেলের হল ঘরের শেষ মাথায় একটা দোলানো চেয়ারে বসেছিলো এক বেশ্যা। ওর মাথার ওপর লাল আলোর বাল্‌ব। আমরা যখন রুমে ঢুকে কাপড়চোপড় খুলছি, লোকটা তার রিভলভার দু'টো এবং মানিব্যাগ রেখে দিলো টেবিলের ওপর। তারপর স্বাভাবিকভাবেই বললো, 'এগুলো যার হাতে প্রথম পড়বে, সে ভাগ্যবান লোক।'

অনেক রাতে ঘুম ভেংগে গেলো আমার। কেন ভাংলো বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখতে পেলাম, ওমারা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাসছে।

'কি ব্যাপার, ঘুমোও নি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন ঘুমোবো।' ও মারা শেয়ালের মতো খ্যাক খ্যাক করে হাসছে তখনো। 'নটীটা বেশ খাসালো, বুঝলে?' সে নামানো গলায় বললো, 'ঘণ্টাখানেক ঢলাঢলি করে এলাম ওর সংগে। খাসা মাল। একবার করলে জীবনেও ভুলবে না। আরে দক্ষিণের খানকিরাও তুলনাহীন।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের বিছানার দিকে তাকালাম ঘুমের বড়ির কল্যাণে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে সে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে ওর পেট মোটা ওয়ালেট আর গুলি ভর্তি রিভলভার দু'টো।

'যাও, জলদি যাও হেনরী। শুভ কাজে দেরী করতে নেই। এই নাও—টাকাটা রাখো। মাগিটাকে আগে পে-কোরো। নইলে চ্যাঁচামেচি করতে পারে।'

এক রকম ঠেলতে ঠেলতেই আমাকে রুম থেকে বের করে দিলো ও'মারা। ওর কাণ্ড কারখানা দেখে ঘুমের রেশ কেটে গেছে আমার। যেন ওকে খুশি করার জন্যেই অগত্যা চোখ মুছতে মুছতে হলঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমি। বেশ্যাটা অল্প সময়ের মধ্যেই ধোয়া মোছা সেরে মুখে পাফ বুলিয়ে ঠোঁট রঙ করছিলো। আমাকে দেখেই চোখ মারলো। আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ওকে দিলাম। নিজে একটা ধরালাম।

'তোমার নাম কি?'

'লিজ—'

'বাড়ি কোথায়?'

'দক্ষিণের লোক আমরা। ঠাঁই-ঠিকানার হাদিস নিয়ে হবেটা কি? পিরিতের আলাপ করার সময় কই অতো। অ্যাঁ? বসতে হলে, কড়ি ফ্যালো। না-বসলে রাস্তা মাপো।'

ও বাবা! এ তো সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি। মুখ না-যেন বিশের শিশি। ওই ঠোঁটে চুমু দিলে আমার ঠোঁট দুটো আবার পুড়ে যাবে না তো? আর লাগাবার পর আমার অন্যান্য পার্টসগুলো অক্ষত থাকবে কিনা, সে গ্যারান্টিই বা কে দেবে। লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিলাম

ওর। তারপর দলা পাকানো টাকাটা রেখে দিলাম ওর হাত ব্যাগের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা পরখ করে, ব্যাগের ভেতর রেখে সে একগাল ধোঁয়া ছুড়ে মারলো আমার মুখে।
'এক ঘণ্টার জন্যে আমি তোমার।' মেয়েটি বললো, 'এই সময়টা তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারো।'
'যা খুশি তাই ?'
'হ্যাঁ— তাই।' মেয়েটি এতোক্ষণ পর হাসলো একটুখানি। আর হাসবার সঙ্গে সঙ্গে ওর আসল রূপের বেশ খানিকটা যেন চোখের সামনে প্রকাশ পেলো এই প্রথম বারের মতো। মাঝারি গড়ন মেয়েটার। বয়েস খুব বেশীও যদি হয় একুশ বাইশ। ব্রেস্ট আর হিপ্ ধারালোই বলতে হবে। চোখ দুটো মোটামুটি। তবে যে জিনিসটা তাকে আর দশটা মেয়ের কাছ থেকে আলাদা করেছে। তা হলো তার দাঁতগুলো। দাঁতগুলো বলা বোধহয় সঠিক হচ্ছেনা। বোধহয় বলা উচিত ওর মুখটার কথাই। মেরিলিন মনরোর মতো, অতোটা পাতলা নয়— কিন্তু ঠোঁট জোড়া দেখলেই মনের মধ্যে তৃষ্ণা জেগে ওঠে। এক ধরনের বন্যতাও যেন রয়েছে ওতে। যা চুম্বকের মতো টানতে থাকে দর্শকের চোখ। খানিকটা প্রতিহিংসাও যেন জাগে। অকারণ-প্রতিহিংসা।
অতো বড়ো হল ঘরটায় আর একটা মানুষও নেই। বোধ-হয় হোটেলের নাইট-গার্ডও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি মেয়ে-টাকে দাঁড় করিয়ে ওর গলার নিচে চুমো খেলাম। তারপর

দু'হাতে আলতো ভাবে চাপ দিলাম ওর আধ খোলা দুধের ওপর। হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠলো লিজি। খুব সম্ভব আমাকে একটা বদ্ধ-আনাড়ি ঠাউরে নিয়েছে সে মুহূর্তের মধ্যেই। এবং আমাকে প্রশিক্ষণ দেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আচমকা টান মেরে আমার প্যান্ট খুলে ফেললো। এতো দ্রুত কেউ অন্য কারো বস্ত্র-হরণ করতে পারে, তা ছিলো আমার ধারনাতীত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখা গেলো, আমার সারা শরীরে এক গাছি সুতো পর্যন্ত নেই। নিউ ইয়র্কে বরফ পড়া শুরু হতে দেখে এসেছি। কিন্তু এটা দক্ষিণাঞ্চল। আবহাওয়া বেশ গরম। এভাবে ন্যাংটো হয়ে কোনো বেশ্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা আমার কাছে অভিনব কোনো ব্যাপার নয় অবশ্য। আমি অপেক্ষা করছি, ও এরপর কি করে তা দেখার জন্যে। আমি বরাবরই নতুনের অভিসারী। বৈচিত্রে বিশ্বাসী। লিজি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর বললো, 'দেখলাম, কোনো খারাপ ব্যারাম ট্যারাম আছে কিনা। দেখতে জানলে খালি চোখেই অনেক কিছু দেখা যায়। সেজন্যে ডাক্তার ডাকতে হয়না। নানী যা শিখিয়েছে, তাতে আজ অব্দি ভুল করিনি কোনো।' লিজি সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেললো পাশে রাখা বালুভর্তি পেতলের গামলাটার মধ্যে। তারপর সেই মারাত্মক হাসিটি হেসে বললো, 'ভয় নেই নাগর আমার-টাও দেখাবো তোমাকে। তাছাড়া ডাক্তারের সার্টিফিকেট

চাইলে তাও পাবে আমার হাত ব্যাগে। কথায় বলে, অসুখ বিসুখের সঙ্গে কোনো খাতির নেই।'

এইবার খানিকটা চমক লাগলো আমার। এ পর্যন্ত বহু নারীর সংসর্গে আসার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু শুরু করার আগে সুস্থতা-অসুস্থতা সম্পর্কে এহেন পরীক্ষা দেয়া এবং নেয়ার ঘটনা কখখনো দেখিনি।

নিজের শরীরের সমস্ত পোশাক খুলে ফেললো লিজি। লাল আলোর নিচে ঝলমল করে উঠলো সে একটা জলপরীর মতোই। নিখুঁত গড়ন ওর। বেশ পয়-পরিস্কার বলেও মনে হচ্ছে। সন্ধে থেকে মাঝরাত অব্দি ক'টা ক্ষেপ মেরেছে, জানিনা। কিন্তু একটু আগেই তো ও'মারা লাগিয়ে গেলো। ওর মোমের মতো সাদা শরীরে একটা লালচে আঁচড়ের দাগও নেই। আমি বেশির ভাগ রমনীকেই দেখেছি যোনি ঢেকে রাখে অবাঞ্ছিত কেশরাশিতে। কিন্তু লিজির যৌনাঙ্গের ওপর দিকটা যেন ছোট একটা শান্ত চাতাল। মার্বেল পাথরের তেকোনা টুকরো কোনো রাসায়নিক উপায়ে নরম করে নিলে যা দাঁড়াবে, অবিকল তাই। পরিপাটি করে বগল এবং যোনির ওপরকার বাল কেটেছে সে। এক কথায়, লাল আলোর তীব্র উচ্ছাসের ভেতর লিজি এখন দাঁড়িয়ে আছে যৌন-আবেদনময় একটা স্ট্যাচুর মতো।

আমি বিছুক্ষণ দেখলাম ওর আপাদমস্তক। ও-ও দেখছিলো আমাকে। কিন্তু আমাদের দু'জনকেই মনে হলো ব্যস্ত সমস্ত।

ওর আছে আরেক মকেল পাকড়াবার ধান্দা। আমার রয়েছে ঘুম। লিজি চট করে উবু হয়ে পড়লো মেঝের ওপর। হাঁটু এবং হাত দুটোর ওপর ভর দিয়ে একটা মাদী হরিণের ভঙ্গীতে প্রস্তুত হয়ে সে নিরব শীৎকারে আহবান জানালো আমাকে। ওর পাছার নিচে অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে স্ত্রী-অঙ্গের। নিটোল নির্মম সেই মারনাস্ত্রটি যেন মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্ছে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। এই কম্পন স্বতস্ফূর্ত নয় খুব সম্ভব। জীবিকার ক্ষেত্রে উপযোগিতা বাড়াবার ইচ্ছায় বহু সাধনার পর হয়তো এই শারীরিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে মেয়েটির পক্ষে। সাধনায় যে সে সফল হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। ওই ভয়াবহ অস্ত্রটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমার তলপেটের নিচে মাংসল দণ্ডটি পরিণত হয়েছে ইস্পাত খণ্ডে। যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে জিনিসটা এক্ষুণি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝের ওপর ছিট্‌কে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অথবা একটা বাত্যা-তাড়িত চড়ুইয়ের মতো তা পাশের খোলা জানালা দিয়ে উড়ে চলে যাবে অজানার দিকে। নিতম্ব এবং উরুর মাঝামাঝি সেই ত্রিকোন জায়গাটা গড়ে উঠার সঙ্গে সংগে কীরকম একটা আশ্চর্য গন্ধও যেন ছড়িয়ে পড়ছে চার পাশে। না, এ কোনো সেন্টের ঘ্রাণ নয়। কোনো ফুলের গন্ধও নয়। বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের এই ঘ্রাণটি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। গন্ধটা যে যোনির ফুটো দিয়েই বাইরে বেরিয়ে আসছে, তাতে আর সন্দেহ কি?

আমি অবিলম্বে চেপে বসলাম মেয়েটির ওপর। চেপে বসলাম, মানে, ও যেমন পশুর ঢঙে বসেছে। আমিও সেরকম পশুর আদলেই চড়াও হলাম ওর ওপর। কোনো ফালতু ধানাই-পানাইয়ের ধারে-কাছেও না গিয়ে সরাসরি নুনু ঢোকালাম ওর পুষির মধ্যে। চপ্ করে একটা শব্দ হলো একবার। তারপর শুরু হলো এক প্রলয় কাণ্ড। মূলত সারাটা হল ঘরেই বিচরণ করলাম আমরা পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায়। যেন বিরতিহীন এক সংগম প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে আছি আমরা দু'জন। কেউ হার মানতে রাজি নই—এই দু'জনের মধ্যেও। ঘোরের মধ্যে একবার কেবল আমার নুনুটা ভীষণ জোরে চিবুতে দেখলাম লিজিকে। এবং তারপর আর কিছুই মনে নেই আমার।

সকাল বেলাতেই রওনা হলাম আমরা আবার।

লোকটা গাড়ি চালিয়ে সোজা টাম্পায় চলে যাবে বলে' ঠিক করেছিলো প্রথমে। কিন্তু কি ভেবে আমাদের জ্যাকসনভিলে নামিয়ে দিয়ে ব্যাক করে ফের চলে গেলো নিজের গন্তব্যের দিকে। কেবল তাই নয়- দশ ডলারের একটা নোটও সে জোর করে দিয়ে গেলো শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ।

'আরো ভেতরে যাওয়ার আগে একটুখানি খোঁজ খবর নিয়ে যেয়ো তোমরা।' লোকটা বললো, 'আমি যদ্দুর জানি, টাকা ওড়াওড়ি বন্ধ হয়েছে ওদিকটায়।' আমরা ওর শুভ কামনা করে ওকে বিদায় জানালাম। লোকটা গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো

আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। ওর জন্যে খুব দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা হলো আমার। আইনের চোখ এড়িয়ে কদিন লুকিয়ে রাখতে পারবে সে নিজেকে? অল্প সময়ের পরিচয়েই দেখেছি, ওই ম্যাকানিক মানুষটা খুবই সরল আর অকপট। সস্থ অবস্থায় একটা মাছিও বোধ হয় সে মারতে পারেনা। একটা দীর্ঘশ্বাস কাঁপিয়ে দিলো আমার বুকখানাকে।

লোকটার সংগে দেখা না হলে আমরা মস্ত বিপদে পড়ে যেতাম। কেননা, সে যখন আমাদের দশ ডলার দিলো, আমাদের কাছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে মোটে চার ডলার অবশিষ্ট তখন। সব টাকা নেডের কাছে। যাহোক, আমরা পোষ্ট অফিসে গেলাম। নেড যথারীতি হাজির ছিলো সেখানে। আশ্চর্য ব্যাপার এই, যে লোকটা নেডকে লিফ্‌ট দিয়েছে, সে-ই তাকে খাইয়েছে এমনকি হোটেলে রেখেছে একই সংগে এক রুমে।

তা, এ পর্যন্ত ভালোই এসেছি আমরা। একবার জায়গাটাকে একটু জরিপ করে নিলে মন্দ হয়না বোধকরি।

অবশ্য পরিস্থিতি আঁচ করতে খুব একটা দেরী হলোনা। আমাদের সারাটা জ্যাকসনভিল থৈ থৈ করছে আমাদের মতোই হাভাতের ভিড়ে। সবাই ছ্যাঁক্‌ খেয়ে ফিরে আসছে টাকা-ওড়া তল্লাট থেকে। ভাবলাম, সময় থাকতে মানে মানে সরে পড়লে কেমন হয়? কিন্তু অহামকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখন। মায়ামীতে আমাদের যেতেই হবে। এভাবে কালো মুখ নিয়ে বাড়ি ফেরা চলবেনা কিছুতেই

অন্তত কিছুদিন দক্ষিণাঞ্চলে কাটিয়ে না-গেলেই নয়। 'কিছু না কিছু কাজ আমরা করতে পারবো নিশ্চয়ই।' নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি আমরা। কিন্তু কাজকর্ম তো দূরের কথা, ঘুমোবার মতো জায়গাও আমাদের নেই। দিনের বেলাটা কাটিয়ে দিই আমরা ওয়াই, এম, সি, এ-তে। স্থানটি দৃশ্যত পরিণত হয়েছে ধর্মপ্রচারক দলের আস্তানায়। কারো মনেই কাজ পাবার কোনো আশা আছে বলে মনে হয় না। সবাই যেন বাড়ি ফেরার জন্যে একটা চিঠি কিম্বা টেলিগ্রামের অপেক্ষা করছে। কেউ অপেক্ষা করছে ট্রেনের টিকেট বা মনিঅর্ডারের জন্যে। কিন্তু প্রতীক্ষার শেষ কোথায়? পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত আমরা পার্কেই ঘুমোচ্ছিলাম। পাকড়াও হবার পর শতাধিক লোকের সঙ্গে জেলখানার মেঝের ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে। ইস, কী জঘন্য অবস্থা। কেউ বমি করছে ওখানেই। কেউ বা মলত্যাগ করে ভরে ফেলছে চারদিক। আমরা আশে পাশে ঘুরে বেড়াই এমন কোনো তুচ্ছ কাজের জন্য, যা অন্ততঃ দু'মুঠো আহার যোগাতে পারে আমাদের। একদিন অমনি এক কাল্পনিক চাকরির আশায় আমরা ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে আট মাইল ঘুরলাম। আমাদের পা কাঁপছিলো। নাড়ি ভুড়ি সব গলে যাচ্ছিলো ক্ষুধায়। আমরা এতো বেশি ক্লান্ত, ভীত এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে— সিঙ্গল-লাইনে— একজনের পেছনে আর একজন হাঁটছিলাম রেড-

ইণ্ডিয়ানদের মতো। রাত্রে আমরা ধর্মপ্রচারক দলের কাছে গিয়ে হৈ হল্লা করলাম। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। মাত্র একজনের জায়গা হলো মেঝের ওপর। বাথরুমে গিয়ে দাস্ত শুরু হলো আমার। সে কি প্রচণ্ড ব্যথা পেটের মধ্যে। আমি চীৎকার করতে লাগলাম। নেড আর ও মারা ধরাধরি করে নিয়ে এলো আমাকে বাথরুমের বাইরে। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে হেঁটে গেলাম আমরা রেলরোড ইয়ার্ডের কাছে। মালগাড়ি-গুলো ভর্তি করা হচ্ছিলো সেখানে ফলফলারি দিয়ে। প্রায় পচে যাওয়া ফলগুলো পাঠানো হচ্ছিলো উত্তরাঞ্চলে। আমরা সেখানে যেতেই একজন শেরিফ তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আমাদের পাছায় বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিলো। কিছু পচা কমলা ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিলো মাটির ওপর। কিন্তু পাষাণ শেরিফ সেগুলো পর্যন্ত কুড়িয়ে খেতে দিলোনা আমা-দের। সেও অন্যদের মতো চেঁচিয়ে উঠলো, 'যেখান থেকে এসেছিস সেখানে চলে যা ব্যাটারা।'

বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপারই বলতে হবে যে নেডের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো তার অতি পুরনো বন্ধু ফ্লেচারের কথা। এখানকারই এক কমার্শিয়াল আর্টিস্ট সে। নেডের সংঙ্গে অ্যাডভার্টাইজিং বিজনেস সূত্রে নিউইয়র্কে পরিচয়। সে বলে-ছিলো, তার একটা স্টুডিয়োও আছে। আমরা তাঁকে ঠিকই খুঁজে পেলাম। কিন্তু সে নিজেই খুব দুর্দশাগ্রস্ত। অন্তত: তার 'স্টুডিয়োটি' দেখে তাই-ই মনে হলো। তবে লক্ষ্যনীয়

ব্যাপার যে, ওইদিন সন্ধ্যায় আমাদের তিনজনকে সে খাবার দাওয়াত করলো। তার হাবভাব দেখে মনে হলো বিয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন করছে সে। এ উপলক্ষে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসারত তার বউকেও সে সাময়িক ভাবে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

'খুব একটা জাঁকজমক হবেনা।' ফ্লেচার বললো, 'তবে অনুষ্ঠান যতোটা আনন্দময় করা যায়, সে চেষ্টায় কার্পন্য করা হবে না। আমার বউটা খুব সুন্দরী। কিন্তু ওর তরফ থেকে কারো কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। গত বছর পনেরো যাবৎ তার এরকম অবস্থা।'

দিনটা যেন আর ফুরোতে চায়না। বস্তুতঃ এটি ছিলো এক দীর্ঘতম দিন। কখন সন্ধ্যা হবে এবং ফ্লেচারের বাড়িতে গিয়ে ভালোমন্দ খাবো, এই চিন্তায় ছটফট করছিলাম আমি। সারাটা দিন ওয়াই, এম, সি, এর মেঝের ওপর পড়ে শক্তি সঞ্চয় করছিলাম, যাতে দাওয়াত খাবার মতো শারীরিক অক্ষমতাও কাটিয়ে উঠতে পারি। ওরা তাস খেলছিলো। আমি পড়ছিলাম খবরের কাগজ। নাড়াচাড়া করছিলাম ধর্মীয় পত্র-পত্রিকাগুলো। প্রচুর অখাদ্য পত্রিকার ছড়াছড়ি চারদিকে। কিন্তু ওইসব লেখাপত্রের ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। লেখা কেন, এই মুহূর্তে যদি নিউ ইয়র্কে একটা বিপ্লব শুরু হয়, আমার তাতে কিছু যাবে-আসবে না। আমার মগজে এখন চিন্তা একটাই—খাদ্য।

ফ্লেচারের ওপর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর জন্যে আমার খুব মায়া হলো। বয়েস প্রায় সত্তরের কাছে এসে পৌঁছেছে। চোখ দুটো হালকা নীল। ঠোঁটের ওপর এক জোড়া ঢাউস গোঁফ। এক কথায় বাফেলো বিলের চেহারা। দেয়ালে তার পুরনো দিনের কাজের নমুনা। যখন সে ঘোড়া এবং কাউ বয়ের ছবিঅলা ম্যাগাজিনের কভার আঁকার জন্যে প্রচুর টাকা পেতো। এখন সে কোনোমতে বেঁচে আছে পেন্সনের সামান্য ক'টা টাকায়। তার আশা, একদিন বড়ো রকম একটা কমিশন মিলে যাবে। মাঝে মধ্যে ব্যবসায়ীদের জন্যে সে এক আধটা সাইন বোর্ডও লিখে দেয় অল্প পারিশ্রমিকে। সে একটা কারণে খুশি যে উষ্ণ দক্ষিণাঞ্চলে তার বসবাস। আমাদের অবাক করে দিয়ে সে দু'টো বোতল নিয়ে এলো দু'হাতে ধরে। একটা বোতলের অর্ধেকটায় জিন, অন্যটায় কিঞ্চিৎ রাই। এর সঙ্গে কিছু লেবু আর কমলার রস আর প্রচুর পানি সহযোগে আমরা কয়েক রাউণ্ডের উপযোগী পানীয় প্রস্তুত করলাম। তারপর পান করতে বসলাম। ফ্লেচারের বউ পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। ফ্লেচার বললো, 'খাওয়া দাওয়া শুরু হবার আগে ওকে এঘরে ডেকে আনবে। 'কোথায় কি হচ্ছে, সে ব্যাপারে তার কিছুই আসে যায় না।' বললো ফ্লেচার। 'তার রয়েছে নিজস্ব জগৎ। সে আমাকে পর্যন্ত চিনতে পারেনা। কাজেই সে কি বললো না-বললো, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। এমনিতে সে খুব শান্ত স্বভাবের

চুপচাপ মানুষ। তাছাড়া হাসিখুশিও—তোমরা তা দেখবে।' ফ্লেচার একটু পরে আবার টেবিল সাজাতে লাগলো। ডিশ-গুলো ভাঙ্গা এবং শ্রীহীন। বাসনপত্র সবগুলোই টিনের। 'খাওয়া দাওয়াটা হবে খুবই নগন্য গোছের,' ফ্লেচার বললো, 'নিতান্তই কোল্ড স্ন্যাক।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে উচ্চারণ করলো সে। টেবিলের ওপর সে রাখলো আলুর সালাদের বৌল। খানিকটা পনির আর ভুনা কলিজা। সেই সঙ্গে কিছু সাদা রুটি আর মার্গারিন---বা কৃত্রিম মাখন। কয়েকটা আপেল আর বাদামও দেখা গেলো একটা পাত্রে। কিন্তু কমলা চোখে পড়লো না একটাও। খাবার সাজানো হয়ে গেলে ফ্লেচার প্রতিটি প্লেটের সামনে রাখলো পানিভর্তি একটা করে গ্লাস। মাঝখানে রেখে দিলো কফি পটটা।

'খাবার এখন রেডি।' ফ্লেচার বললো, 'এক মিনিট সময় চাই আর। পাশের রুম থেকে লরাকে ডেকে নিয়ে আসছি আমি।' আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। শুনতে পেলাম ফ্লেচারের নরম গলার আওয়াজ। আস্তে আস্তে কথা বলছে সে। সেই সঙ্গে স্ত্রীর হাত ধরে খুব সম্ভব তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

বউকে এঘরে এনে, আলতোভাবে সে বসিয়ে দিলো একটা চেয়ারে। তার চোখ দুটো ছলছল করলেও মুখে হাসি। 'এই তো এসে গেছি আমরা।' ফ্লেচার বললো, লরা, এঁরা আমার বন্ধু---তোমারও বন্ধু। এঁরা আমাদের সঙ্গে খাবেন।

চমৎকার হবে, তাই না ?

আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। প্রথমে ফ্লেচার-গিন্নির সঙ্গে, তারপর ফ্লেচারের সঙ্গে করমর্দন করলাম। আমাদের সবার চোখই ছলছল করছিলো। যাহোক, সবাই সামনে রাখা গ্লাস উঁচু করে ধরে ওদের পঞ্চবিংশতিতম বিবাহ বার্ষিকীর প্রতি শুভ কামনার নিদর্শন স্বরূপ পানি পান করলাম।

পানাহারের পর গান। সেখানে গলা মেলালাম আমরা সবাই। এমনকি লরা এবং ফ্লেচারও। আমরা গাইলাম, 'হে সুজানা,' 'রেল লাইনে বসে আছে ব্যাঙটা,' 'অ্যানি লরি,' 'বুড়ো কালো জো,'…। বেশ জমে উঠলো এই ক্ষুদ্র এবং বিষণ্ন অনুষ্ঠানটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই খিদে পেয়ে গেলো আবার আমাদের। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আশে পাশে কোথায় রুটি আছে কিনা। থাকলে আমরা ফ্রেঞ্চ কেক বানিয়ে নিতে পারি। অনেক খুঁজেও এক টুকরো রুটি পাওয়া গেলো না। আমরা খালি বফিই খেতে লাগলাম অগত্যা। দু'চোখের শূন্য দৃষ্টি ছাড়া মনুসিক অসুস্থতার কোনো লক্ষণই দেখলাম না লরার মধ্যে। সে আমাদের সঙ্গে খেলো, গান গাইলো, হাসিতামাসায় অংশ নিলো। দিব্যি ভালো মানুষ। কিছুক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়ালো। বোঝা গেলো ঘুমোতে চাইছে। আমরা সবাই মিলে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলাম বিছানার দিকে। ফ্লেচার ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভ্রূর ওপর চুমো খেলো আলতো ভাবে। তারপর আমাদের খাবার টেবিলে বসিয়ে রেখে পাশের

বাড়ি থেকে আধ বোতল বার্বন আর একটি ছোট্ট ব্যাগ ভর্তি কেক নিয়ে এলো। আর এক রাউণ্ড কফি খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম আমরা। স্টোভটা জ্বলতেই থাকলো। সত্যি বলতে কি, জ্যাকসনভিলে আসার পর এটাই আমাদের প্রথম আরামদায়ক ও আনন্দময় সন্ধ্যা।

'আমি যখন প্রথম এদিকটায় আসি,' ফ্লেচার বললো, 'আমার অবস্থাও খারাপ ছিলো খুব। পায়ের নিচে মাটি পেতে সময় লেগেছে। নেড তুমি এক কাজ করোনা কেন? খবরের কাগজের অফিসে যাও না একবার। আমার এক বন্ধু ওই কাগজের অন্যতম সম্পাদক। সে হয়তো তোমার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করতেও পারে।'

'কিন্তু আমি তো লিখতে টিকতে পারিনা।' নেড বললো।

'না-হয় হেনরী তোমার নামে লিখে দেবে।' বললো ও'মারা।

'তোমরা দু'জনেই যাও না কেন?' বললো ফ্লেচার।

আমরা চাকরিটার ব্যাপারে এতই উল্লসিত হয়ে উঠলাম যে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগলাম মেঝের ওপর।

রাতটা আমরা কাটিয়ে দিলাম ফ্লেচারের স্টুডিওতে। মেঝেয় পড়ে দিব্যি ঘুমালাম সারাটি রাত। পরদিন সকালেই নেড আর আমি গেলাম খবরের কাগজের অফিসে। দেখা করলাম ফ্লেচারের বন্ধুর সঙ্গে। দু'চার কথার পর আমি উৎরে গেলাম। কিন্তু নেডের কাছে লেখা চাইলেন সম্পাদক সাহেব। বললেন,

'আপনি কনটি্বিউট করুন। টাকা পাবেন।'

চাকরিতে জয়েন করলাম। বেতন পাবো ঝাড়া ছ'সপ্তাহ পর। এই চৌদ্দদিন কীভাবে কাটবে মাথায় এলোনা আমার। না খেয়ে তো আর চাকরি করা যাবেনা।

ও'মারার কাছে একজন আইরিশ ধর্মযাজকের ঠিকানা ছিলো এখানকার। ওই দিনই বিকেলে আমরা খুঁজে খুঁজে বের করলাম সেই বাড়িটা। বাড়িটা, মানে, গির্জাই আর কি। যে সিস্টারটি দরজা খুলে দিলো, তাকে খুব দয়াময়ী বলে মনে হলো না। সে খবর দিলো, গুডফাদার গ্যারেজে তাঁর গাড়ির পরিচর্যা করছেন। গ্যারেজে গিয়ে ও'মারা ধর্মযাজকের কাছে নিজেদের দুর্দশার কথা খুলে বললো। জবাবে তার মুখের ওপর হাভানা চুরুটের কড়া ধোঁয়া উগরে দিলেন গুডফাদার। যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলছেন, 'এই মুহূর্তে এখান থেকে ভাগো। আর কক্ষনো এমন শান্তিভঙ্গ করতে আসবে না।' মোদ্দাকথা, এইটুকু পাওয়া গেলো ফাদার হুলিহানের কাছ থেকে।

পরদিন বিকালে একটা সিনাগগের ভেতর ঢুকে পড়লাম আমি। সেখানে আয়োজন করা হয়েছে হিব্রু প্রার্থনা সভার। প্রার্থনা শেষে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম র‍্যাব্বির সামনে। নিজের দুর্বিপাকের বর্ণনা দিয়ে কিছু খাবার আর মাথা গোজার মতো একটু ঠাঁই চাইলাম। আমরা যে তিনজন—সেকথা আর তাঁকে বললাম না।

'কিন্তু তুমি তো ইহুদী নও।' বললেন র‍্যাব্বি।

'আমি ইহুদী নই, আমি ক্ষুধার্ত।' জবাব দিলাম আমি।
'ক্ষুধার্তের কাছে তার পরিচয় একটাই, সে ক্ষুধার্ত।'
'তুমি খৃস্টান-গির্জায় চেষ্টা করোনি কেন?'
'করেছি। কিন্তু খ্রীস্টানও আমি নই। আমি ভদ্দরলোক।'
র‍্যাব্বি স্থানাভাবের কথা জানালে, আমি বললাম, 'আপনি কি আমাকে কিছু খেতে দিতে পারেন?
আমাকে তখন জানানো হলো যে, ডাইনিং-রুম বন্ধ হয়ে গেছে বেশ ক'ঘন্টা আগে।'
'আমি যা পাবো, তাই খাবা।' আমি বললাম। 'আপনাদের এখানে কি পচা কমলা বা কলাও নেই?'
তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। থ' মেরে গেছেন বলেই মনে হলো।
'আমাকে একটা সিকি দেবেন, শুধু একটা সিকি?' আমি ভিক্ষা চাইলাম।
তিনি বিরক্তভাবে পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। বললেন, 'এখন সরে পড়ো তো বৎস। যতোসব লোফার এসে জুটেছে উত্তর থেকে।'
আমি একটিও কথা না-বলে পেছন ফিরে রওনা হলাম। সদর রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, খুব সন্দর চেহারার একটা লোক খবরের কাগজ বিক্রী করছে। ওর চাউনির মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যাতে ওকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে ইচ্ছে করলো আমার।

'এই যে, আমি বললাম, 'কেমন চলছে ?'

'খুব খারাপ নয়। কোত্থেকে আসছো তুমি, নিউ ইয়র্ক ?'

'হাঁ। আর তুমি ?'

'জার্সি সিটি।'

'হাত মেলাও।'

কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো, আমি ওই লোকটার কাছ থেকে কিছু পত্রিকা চেয়ে নিয়ে বিক্রী করে বেড়াচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিক্রী শেষ আমি রোজগার করলাম কয়েকটা পেনি মাত্র তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ওয়াইয়ে। দেখি, আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পত্রিকা পড়ছে ও'মারা।

'চলো, খেয়ে আসি।' আমি বললাম, ওর পায়ে ধাক্কা দিতে দিতে

'অ্যাঁ! হাঁ, চলো।' লাফিয়ে ওঠে ও'মারা। 'চলো ডেল মোনিকোয় যাই।'

'আরে অতো পয়সা নেই।' আমি বললাম, 'এক মুঠো করে বাদাম আর এক পেয়ালা করে কফি হবে, যা পয়সা আছে আমার কাছে। চলো।'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালো ও'মারা। হাঁটতে হাঁটতে সবকথা আমি খুলে বললাম ওকে।

'লোকটাকে খুঁজে বের করতে হয় এক্ষুনি।' ও'মারা বললো, 'মনে হচ্ছে ভালো মানুষ। জার্সি সিটির কথা বললে না ?

ভালো লোক হতেই হবে তাহলে।'

লোকটার নাম মুনি। আমরা ওকে পাকড়াও করে ফেললাম। 'তোমরা আমার রুমে ঘুমাতে পারো।' সে বললো, 'আমার ঘরে একটা বাড়তি খাট রয়েছে। জেলখানার চাইতে ভালো ভাবে ঘুমোতে পারবে সেখানে।'

খুশি হলাম কিন্তু মনের মধ্যে খানিকটা দুঃখও হলো। কোথায় খবরের কাগজে চাকরি করবো। এখন তার বদলে খবরের কাগজ বেচতে হচ্ছে। প্রথম দিনেই সম্পাদকের সঙ্গে একটা লেখা নিয়ে তর্ক । আমি নরম হলে কোনো অঘটন ঘটতো না কিন্তু পারলাম না বললাম, 'করলাম না আপনার চাকরি' বলে গট গট করে বাইরে। নেভের লেখা-গুলো যে আমাকে লিখতে হবে তা জানতাম। ক্ষোভের সঙ্গে চিন্তা করলাম সে লেখাও ওকে লিখে দেবো কিনা।

যাহোক পরদিন মুনির কথা মতো খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে আমরা এক বাণ্ডিল পত্রিকা কিনে নিলাম। বলাই বাহুল্য, কাগজ কেনার জন্যে টাকা ধার দিলো মুনিই। তা-জনাপঞ্চাশেক ছোকরা কাগজের জন্যে হৈ চৈ করছিলো। সবাই আগে পত্রিকা পেতে চায়। আমি একটা লোহার বেড়ার গায়ে লাগানো জানালা দিয়ে কাগজের জন্যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি, একটা নিগ্রো ছোকরা আমার মাথার ওপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে পত্রিকা নেবার আশায়। আমি ঝাঁকি মেরে আমার ঘাড়ের ওপর

থেকে ওকে নিচে ফেলে দিলাম। ও করলো কি, আমার পায়ের নিচ দিয়ে বুকে হেঁটে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলো। এই দৃশ্য দেখে সবাই হাসতে লাগলো হো হো করে। আমিও তাতে যোগ দিলাম। যাই হোক, অল্পক্ষণের ভেতর কাগজ নিয়ে আমরা সদর রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। মুখটা হাঁ করে চ্যাঁচানো ব্যাপারটা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ বলে মনে হয়। আমি পথচারীর গায়ে কাগজ দিয়ে ঠেলা মেরে মেরে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে কাজ হলোনা একদম। আমার অবস্থা দেখে মায়া হলো মুনির। সে গলা ছেড়ে হাঁক দিয়ে কাগজ বেচার কায়দা শেখাতে লাগলো আমাকে। কিন্তু চ্যাঁচামেচি করেও তিন চার কপির বেশি পত্রিকা বেচতে পারলাম না। অথচ বিকেলেই বেরিয়ে যাবে এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ না- ফুরোলে দ্বিতীয় সংস্করণ আনবো কীভাবে?

একটা পার্কে ঢুকে কাগজগুলো ঘাসের ওপর রেখে লেকের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এক ঝাঁক পাতি হাঁস ভাসছে পানিতে। আমি সেগুলোকেই দেখছিলাম। সর্বমোট সাত-খানা পত্রিকা বিক্রী হলো শেষ পর্যন্ত। ও'মারা আমার চেয়ে কিছুটা ভালো করেছে। কিন্তু তাতে কি? কফি আর বাদাম ছাড়া অন্য কিছু খাবার মতো পয়সা জুটছে না। মুনি আমা-দের ওপর মনক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। আমরা তো আর ওর মতো জাত হকার নই? কিন্তু হকার

হলেও সে লোকটা ভালো। আরো পাঁচটা ডলার দিয়ে সে বললো, 'তাহলে অন্য কিছু করা যায় কিনা, খুঁজে দ্যাখো। আমি যাই। সেকেণ্ড এডিশন বোধ হয় বেরিয়ে গেলো এতোক্ষণে। রাত্রে লাঞ্চ কাউন্টারে দেখা হবে। কেমন?' হাসি মুখে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেলো মুনি।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমরা দু'জনেই তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দেখা হলো এক ফুর্তি-বাজ খনি শ্রমিকের সঙ্গে। পেনসিলভ্যানিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসে আমাদের মতোই ফেঁসে গেছে বেচারা। কফি আর বাদাম খেতে খেতে আলাপ হলো লোকটার সঙ্গে।

'কী বলবো আর তোমাকে?' লোকটা বললো, 'তার চেয়ে চলো নটীবাড়ির দিকে যাই। এক পাত্র মদ খাওয়াতে পারলেই অনেকে খুশি। তোমাকে ওপর তলার মাগিদের কাছে যাবার দরকার নেই। যাই হোক, সময়টা খুব তরতর করে কেটে যাবে। তোফা জায়গা। হরদম গান বাজনা হচ্ছে। ওই লাশকাটা ঘরটার চাইতে (ওয়াই, এম, সি,এ) অনেক ভালো পরিবেশ পাবে ওখানে।'

লোকটা আমাদের অদ্ভুত একটা তথ্য জানালো। ওয়াই, এম, সি,এ-তে ঘুর ঘুর করতে আসে অন্য ধর্মের স্বেচ্ছাসেবকরা। তাদের সঙ্গে গিয়ে ধর্মান্তরিত হলে এক বেলা ভালো খেতে দেয় ওরা। সে নিজে এক দিন পেটপুরে খেয়ে এসেছে। আমাদেরকেও পালা করে যাবার পরামর্শ দিলো।

যতোক্ষণ পারলাম বেশ্যাপাড়াতেই কাটিয়ে দিলাম আমরা। অনেক মেয়েই পেছনে লেগেছিলো আমাদের। কিন্তু কেটে পড়তেও দেরি করেনি কেউ।

'অবশ্য এরা কেউ স্বর্গবাসিনী নয়, এখানে।' লোকটা বললো, 'একটা ডলার দিলেই লাগানো যায় একবার। প্রায় সব মাগিরই এক দর। কিছু মেয়ে দেখতেও কিন্তু বেশ সুন্দরী। তাই না?'

মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম নিষিদ্ধ পল্লী থেকে। রাত্রে মোনার কথা মনে হলো খুব। এ পর্যন্ত ওর একটি মাত্র চিঠি পেয়েছি। তাতে লেখা আছে একটি দুঃসংবাদ। আদালতে যেতে হয়নি ভাগ্যের জোরে। তবে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে যে কোনো সময়। বাড়িঅলার উকিল মামলা করার আগে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছে। তা, বাড়ি ছেড়ে দিলে থাকবে কোথায় ওরা? মোনাই বা যাবে কোথায়?

পরদিন ওয়াই, এম, সি-এ-তে বসে রইলাম এই আশায়, যদি কেউ ফুসলে নিয়ে ধর্মান্তরিত করতে চায়? কিন্তু কোথায় কি। শেষে ক্ষুধায় ক্ষেপে গিয়ে সরাসরি চলে গেলাম মানবেতর প্রাণীর পর্যায়ে। নানা রেস্তোরায় ঘুরে ঘুরে যোগাড় করলাম একরাশ এঁটো খাবার। আধখাওয়া রুটি, টকে যাওয়া দুধ, পচা পনির, এমনকি কফি পর্যন্ত সংগৃহীত হলো। ও'মারা রাস্তার একদিক দিয়ে এবং আমি অন্যদিক দিয়ে হেঁটে গেলাম। কোনো রেস্তোরাঁই আমরা বাদ দিলাম না।

এঁটো কাঁটার একটা ছোটখাটো পর্বত নিয়ে আমরা এলাম

নেডের কাছে। সে ছিলো ফ্লেচারের বাসায়। আমরা একটা বিশাল ভোজ সভার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। খাবার তৈরি করতে বেশি দেরী হলোনা অবশ্য। এবং তা প্রস্তুত হবার সংগে সংগে আমরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম প্লেটের ওপর।

'মুনির কথা আমরা একটি বারও মনে করলাম না—।' ও'মারা বললো, 'ভালো হলোনা কাজটা।'

'মুনি কে?' জিজ্ঞেস করলো নেড।

আমি খুলে বললাম সমস্ত কথা। নেড সেই যে হাঁ করেছে, আর তার ঠোঁট দু'টো জোড়া লাগছে না।

'হায় যীশু, একি শুনছি আমি?' নেড বললো, 'আমি যে ভাবতেই পারছি না। তোমরা যখন নিচ থেকে পত্রিকা নিচ্ছিলে আমি তখন অফিসের ওপর তলায়। হায়, আমার নাম নিয়ে ওতে যে তোমার লেখা ছাপা হয়েছিলো, আশ্চর্য, যার লেখা ছাপা হয়েছে সে কাগজ বেচছে। খবরটা সময় মতো ডলরিককে জানাতেই হবে। জানো, ওরা লেখাটার বেদম প্রশংসা করেছে?'

তা, ওই লেখা ফেরার কথা আমার মনে থাকলে তো? হয়তো ওয়াই, এম, সি, এতে কাগজ খুলে ও লেখা আমি পড়েও থাকবো। কিন্তু ওটি যে আমার লেখা, তা হয়তো আমি খেয়ালও করিনি।'

'হেনরী,' ফ্লেচার বললো, 'তোমার এক্ষুনি ফিরে যাওয়া

উচিত। এই ছোকরা ছুটো এখানে থাকে থাকুক। সময় নষ্ট করছে করুক। কিন্তু তুমি নও। এসব কাজ করার জন্যে জন্ম হয়নি তোমার। অনেক বড়ো কাজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

আমি লজ্জা পেয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করলাম।

'শোনো—' ফ্লেচার বললো 'এতো সঙ্কোচের কি আছে, তোমার প্রতিভা আছে। যে কেউ তা স্বীকার করবে। তুমি কি হবে, তা জানি না। সন্ন্যাসী, দার্শনিক না কবি—তা জানা নেই আমার। কিন্তু তুমি যে একজন শিল্পী, সেটা নিশ্চিত। সবচেয়ে যা বড়ো কথা, তা হলো তুমি পচে যাওনি। আ-কাটা হীরের মতোই অনেকটা। তোমার মধ্যে এমন এক আত্মভোলাকে আমি দেখতে পেয়েছি, যে আমাকে অনেক কিছু বলে দিয়েছে।'

নেডকে খুব অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিলো। সে অপরাধীর মতো বললো, 'আমি চেক পাবার সঙ্গে সঙ্গে হেনরীকে ট্রেনের ভাড়া দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। আমি কেবল এই কাজটিই করতে পারি। ও মারা আর আমি মাটি কামড়ে এখানেই পড়ে থাকবো।'

'তাহলে তোমার নামে খবরের কাগজের লেখাগুলো কে লিখবে?' জিজ্ঞেস করলো ও মারা।

'সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে এর মধ্যেই।' নেড বললো, 'ওরা আমাকে আর্টিস্টের চাকরি দিচ্ছে সামনের সপ্তাহেই। যার

কর্ম তারে সাজে। আমি টাকাও তখন অনেক বেশি পাবো।'
'তাহলে আমাকে খানিকটা সাহায্য করতে পারবে তুমি।'
বললো ফ্লেচার।
'অবশ্যই পারবো।' নেড বললো, 'আমি তা চিন্তাও করেছি।'
ফ্লেচারের বাড়িতেই রাত কাটলো আমাদের। আমি অবশ্য
ঘুমোতে পারলাম না। মেঝেটা শক্ত বলে নয়···মোনার
কথা ভেবে। মনে হলো যাই নিউইয়র্ক। কিন্তু যাই বললেই
তো যাওয়া যায় না। নেডের চেক পাওয়ার আরো
কয়েক দিন বাকি আছে। অতোদিন অপেক্ষা করা কি
আমার জন্যে সম্ভব? হঠাৎ বাবার কথা মনে হলো। বুড়োকে
লিখলে পুরোটা না-হোক···ভাড়ার একটা অংশ হয়তো
পাঠাতে পারবে। আর তাতে যদি রিচ মণ্ড অব্দিও পৌঁছতে
পারি···বাকি পথ, যাই হোক, একভাবে যাওয়া যাবে।
ভোর হতে না হতেই আমি বাবার কাছে টেলিগ্রাম করার
জন্য হাজির হলাম টেলিগ্রাম অফিসে। রাত নেমে আসতে না
আসতেই টাকা এসে গেলো। এবং পুরো ভাড়ার টাকাই।
আমি খাবার কেনার জন্য আরো পাঁচটা ডলার ধার করলাম
মুনির কাছ থেকে। এবং রাতের গাড়িতেই চেপে বসলাম।
ট্রেনে উঠতেই নিজেকে যেন নতুন মানুষ বলে মনে হতে
লাগলো আমার। যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। অর্ধ
ঘণ্টার মধ্যে আমার মগজ থেকে মুছে গেলো জ্যাকসন-
ভিলের নাম। আরাম দায়ক আসনে বসে মোনার কথা

ভাবছি আমি। পকেটে টাটকা পাঁচ ডলারের নোট। মনটা ঝলমল করে উঠলো খুশিতে। ফ্লেচার বলেছে, আমি নাকি শিল্পী। সত্যি কি আমি শিল্পী? নিশ্চয়। কিন্তু এখনো আমি তা প্রমাণ করতে পারিনি। এরকম একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে নিজের ওপর দারুন খুশি হয়ে উঠলাম আমি। অভিজ্ঞতাই তো মানুষের সর্বস্ব। কথাটা বারবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম আমি। কথাগুলোর মধ্যে হয়তো খানিকটা ছেলেমানুষী আছে। কিন্তু আমার অশান্ত মনের ওপর তা যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে লাগলো।

৫

আবার ফিরে এসেছি দক্ষিণে। এবার অ্যাশভিল। নানা ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে ও'মারা এসে মোটামুটি থিতু হয়েছে এখানে। তার মতে স্বর্গের পরেই অ্যাশভিল। টমাস উল্‌ফ জন্মেছেন এই মাটিতে। চেরোকিদের স্বপ্নপুরী। এখানে টাকা পয়সা রোজগার করতে ঘাম ছোটেনা। ও'মারা এইসব প্রলোভনে ভরা কথা বলে' আবার আমাকে এনেছে অ্যাশভিলে। কিন্তু

এবারও আমাদের দেরী হয়ে গেছে। টাকা উড়াউড়ির পালা শেষ হলেই আমরা কাজের খোঁজে এসেছি এখানে। অবস্থা ফের খারাপের দিকেই যাচ্ছে ক্রমশ। রিয়াল-এস্টেট ব্যবসার হুজুগ শেষ। প্রচার কর্মী হিসেবে আমার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও আর নেই। বস্তুতঃ কোনো রকম চাকরিই নেই। ভাগ্যিস, ও'মারা কিছু টাকা সঞ্চয় করে রেখেছিলো। এতে আমাদের বেশ কয়েক সপ্তাহ চলে যেতে পারে। জায়গাটা আমার কাছে অবশ্য একটা কারণে ভালো লেগেছে। এখানে কেউ যদি কিছুদিনের জন্যে এসে লেখাপত্র নিয়ে কাটায়, তার উপকার হবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মোনাকে নিয়ে। দক্ষিণাঞ্চলটা ঠিক ওর জন্যে নয়। আমি আশা করেছিলাম, আস্তে আস্তে মানিয়ে নেবে। সত্যি কথা বলতে কি নিউ ইয়র্কের বাইরে সে কমই এসেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। ও'মারা আমাদের থাকার জন্যে একটা বাংলো ধরনের বাড়ি ঠিক করেছে। তার মতে বাড়িটি রেঞ্চারের। কোনো ভাড়া গুণতে হবে না। অথচ লেখার মতো চমৎকার পরিবেশ পাওয়া যাবে এখানে। শহর থেকে বেশি দূরেও নয় জায়গাটা। পাহাড়ের ওপর এরকম বাড়িতে বাস করতে পারা ভাগ্যের কথা। ও'মারার কথাবার্তা শুনেই মনে হয়েছিলো, আমদেরকে ওই পাহাড়ী বাংলোয় পাঠিয়ে দিতে পারলেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাই হোক, আমরা ওর

শহরে-ডেরা ছেড়ে তখন-তখনই রওনা হয়ে এসেছি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

কম বয়সের একটা হাবাগোবা লোকের সাহায্যে খচ্চরের পিঠে চড়ে আমরা পাহাড়ে উঠলাম। চারদিকে নেমে এসেছে পিচকালো অন্ধকার। খচ্চরের পিঠে আমি আর মোনা। ঝর্নার গর্জন কানে আসছে আমাদের। খচ্চরটা আমাদের পিঠে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠছিলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো আমাদের বাংলোয় পৌঁছতে। উঃ, চারদিকে এমন অন্ধকার যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায়না। আর সেকি মশা? ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো আমাদের ওপর। হাবা ছোকরাটা একটা কথাও বলেনি এতোক্ষণে। ঘরের দরজা খুলে লণ্ঠনটা জ্বেলে নিলো। তারপর টাঙ্গিয়ে দিলো একটা পেরেকের সঙ্গে। দেখেই বোঝা যায়, বছরের পর বছর যাবৎ খালি পড়ে আছে ক্যাবিনটা। কেবল আবর্জনাই নয়। ধুলো, ইঁদুর, মাকড়শা সহ সব রকমের কীটপতঙ্গে এক রকম ভর্তি। পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে পড়লাম আমি আর মোনা। ছেলেটা শুলো আমাদের পায়ের কাছে, মেঝের ওপর। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ফড়্ ফড়্ শব্দ করে চামচিকে উড়ছিলো। মশার কামড়ে ফুলে উঠছিলো সর্বাঙ্গ। কিন্তু এর মধ্যেও ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

কেবল দুটি চোখের পাতা এক করেছি— হঠাৎ মনে হলো

মোনা আমার হাতে খোঁচা মারছে।

'কি হলো আবার?' আমি ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলাম। সে উবু হয়ে আমার কানের কাছে চাপা গলায় কিছু বললো।

'আরে ধেৎ।' আমি বললাম, 'তুমি স্বপ্ন দেখছিলে হয়তো বা।' আমি আবার পাশ ফিরে শুলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার খোঁচা।

'ওই ছেলেটা।' মোনা নিচু স্বরে বললো, 'আমি নিশ্চিত, সে আমার পায়ে হাত বুলোচ্ছিলো।'

আমি উঠে বসে দেশলাই জ্বালালাম। তারপর নির্বোধটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালাম। সে ওদিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে. দু'চোখ বন্ধ এবং স্থির।

'তোমার মনের ভুল ওটা।' আমি বললাম, 'ব্যাটা তো গভীর ঘুমে ডুবে আছে।'

কিন্তু মনের মধ্যে খট্‌কা লাগে আমার। বোবাটা তো বদ-মাশও নয়? কথা বলার শক্তি না-থাক দেহটা তো পাথরের মতো শক্ত। আমি আচমকাই দেশলাই জ্বালালাম আবার। সেই ফাঁকে ঘরের মধ্যে ত্বরিৎ চোখ বুলিয়ে নিলাম, দরকার হলে ব্যবহার করার মতো কোনো হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা।

ঘুম ভাঙ্গলে পাগলের মতো গা চুলকাতে লাগলাম আমরা। তাছাড়া যা গরম পড়েছে! বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাপও বাড়তে লাগলো। হাবাটাকে পানি আনতে বলে আমরা

তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে নিলাম। এখানে আর এক দণ্ড নয়। ঘরটাকে এবার ভালোভাবে দেখতে লাগলাম আমরা। গাছ আর ঝোপঝাড়ে ঢেকে রেখেছে বাংলোটাকে জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঝর্ণার আওয়াজ আর পাখির কাকলী অবশ্য কানে আসে ও মারার কথাগুলো কানের ভেতর যেন গলানো সীসে ঢেলে দিচ্ছে আমার, তোমার মতো মানুষের জন্যেই যেন তৈরী হয়েছে বাংলোটা।·· একটা আদর্শ নির্জ্ঞাতবাস।' খচ্চরের পিঠে বসে নিচে নামার সময় দিনের আলোয় পথটা দেখে শিউরে উঠলাম। এই পথ দিয়ে অমন অন্ধকারের মধ্যে উঠেছিলাম আমরা একচুল এদিক ওদিক হলেই গভীর খাদে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু। কিছুদূর নামার পর আমরা পায়ে হেঁটে যেতে লাগলাম। অবশ্য পা হড়কে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

পাহাড়ের ঢালে নেমেই আমরা পেয়ে গেলাম পুরো পরিবার-টিকে। এক ডজনের বেশি ছেলেমেয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। যাদের বেশির ভাগই আবার আধ-ন্যাংটো। আমরা খোঁজ খবর নিলাম, ওদের সঙ্গেই সকালের নাশতাটা সেরে ফেলা যায় কিনা। আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হলো। শুনলাম নাশতা তৈরী হচ্ছে। সময় মতো ওরা আমাদের ডাকবে। আমরা বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল সাতটাও বাজেনি। অথচ গরমে

যে সেদ্ধ হয়ে যাবো একেবারে।

ভেতরে গিয়ে দেখি, পুরো পরিবার টেবিলের চারদিকে গোল হয়ে বসেছে। হঠাৎ প্লেটের দিকে চোখ পড়তেই শির শির করে উঠলো আমার শরীর। খাবারের মধ্যে কালো কালো যে ফুটকিগুলো দেখতে পাচ্ছি, তা কি মাছি? টেবিলের দু'দিকে দাঁড়িয়ে দুটি কম বয়েসী ছেলে তোয়ালে নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিলো অবিরাম। আর সে তোয়ালে-গুলো যা নোংরা! ইস গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। যাই হোক, আমরাও বসে গেলাম। আর বসার সঙ্গে সঙ্গে মাছিও এসে বসতে শুরু করলো আমাদের কান, চোখ, নাক, চুল আর দাঁতের ওপর। বাড়ির বুড়ো কর্তা খাওয়া শুরু করার আগে প্রার্থনা জানালো ঈশ্বরের উদ্দেশে। সবাই তখন চুপ করে রইলো।

নাশতায় দেয়া হয়েছে বেকন, ডিম, রুটি, কফি, হ্যাম এবং এরকম আরো দু'একটি পদ। মাথা পিছু পঁচিশ সেন্ট করে দিতে হবে আমাদের। অবশ্য মাছির জন্যে বাড়তি কিছু দেওয়ার দরকার নেই।

পত্র পাঠ আমাদেরকে এমন ফিরে আসতে দেখে ও'মারা তো তাজ্জব। 'সহ্যশক্তি নেহাৎ অল্প।' মৃদু হেসে বললো সে।

'আমি যে মশা-মাছি দেখতে পারিনা, তা তো তুমি জানোই।' আমি বললাম।

ভাগ্য ভালো সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে দেখা হয়ে গেলো মিস্টার রাউলিনসের সঙ্গে। ইনি ছিলেন আমার স্কুল শিক্ষক। তিনি খুব কম ভাড়ায় একটি সুন্দর রুম ভাড়া দেওয়া হবে বলে জানালেন আমাদের। বাড়িঅলার কাছে একটা চিঠিও লিখে দিলেন। আমরা এক সপ্তাহের ভাড়া আগাম দিয়ে ঘরটা ভাড়া নিলাম। আমাদের হাতে যা রইলো, তাতে সাতদিন পেট পুরে খেতে পারবো মিষ্টার রাউলিনসের রেস্তোরাঁয়। আমরা আমাদের টাকাতেই চলছি এখনো। ও'মারার তহবিলে হাত পড়েনি। আমরা আমাদের বাসায় আছি নিজেদের মতো। ও'মারা তার ডেরায় আছে তার মতোই। আমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই।
মন্দ কাটছিলো না দিনগুলো। কিন্তু টাকা-পয়সা ফুরিয়ে এলো কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই। রুম ভাড়া জমে গেছে কিছু দিনের। খাবার টাকাও নেই হাতে। কী করবো ভাবছিলাম। হঠাৎ ক্রনস্কির টেলিগ্রাম। একেবারে অভাবিত ভাবে। বউ নিয়ে সে কোথায় যেন যাবে। পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চায়।

ওকে দেখেই যে কথাটা আমার মুখ থেকে প্রথম বের হলো, তা হলো, ওর কাছে বাড়তি কিছু টাকাকড়ি আছে কিনা।
'কতো দরকার?' ক্রনস্কি হাসলো, 'পঞ্চাশ ডলারে হবে?'
আমি খুশিতে ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরলাম ক্রনস্কি

বললো, 'তা টাকা ফুরিয়ে গেছে, আমাকে তার করলেই পারতে। তা, জায়গাটা কি খুব ভালো লাগছে তোমাদের? মনে হয়না। সত্যি বলতে কি, আমার কাছে খুব সুবিধে মনে হয়না। যেখানে নিগ্রো নেই, ইহুদী নেই— সেটি আবার কেমন জায়গা? শুনলেই তো কেমন কুঁকড়ে যাই আমি।'

একসঙ্গে খেতে বসে অনেক কথা হলো। আমি কীরকম লিখছি, জানতে চাইলো ক্রনস্কি। বুঝতে দেরী হয়নি তার। খুব একটা ভালো নেই আমরা। বললো, 'অবস্থাটা আঁচ করেই তো দেখতে এলাম। যাহোক, আমরা মোট ছত্রিশ ঘণ্টা সময় পাবো এখানে থাকার। এই সময়টা কাটিয়ে দেবো তোমাদের সঙ্গেই। তা তোমাদের এখানে দেখার মতো কি কি আছে দেখাও দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, 'জুনালেস্‌কা হ্রদের নাম শুনেছো? তাছাড়া আছে ওয়েন্‌সভিলের মতো জায়গা। আমার তো বারবার মনে হয়, পারলে ওখানে একটা বাড়ি করে ফেলি।'

'তুমি থাকবে এই দক্ষিণে? তবেই হয়েছে।' ক্রনস্কি বলে উঠলো, 'তুমি হচ্ছো জাত-নিউইয়র্কার। তাছাড়া তোমার মতো মানুষ কেন পড়ে থাকবে এই সব বিদঘুটে জায়গায়? তোমার জায়গা পৃথিবীতে একটাই—ফ্রান্স। তুমি তা বুঝতে পারো কি?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে তার সঙ্গে ঐক্যমত প্রকাশ করলো

মোনা। 'তুমিই একমাত্র লোক, যে নাকি ওর ভেতরের ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে।' বললো সে।

'আমি খানিকটা ধাতস্থ হয়ে নিই।' ক্রনস্কি বললো, 'তোমাদের দু'জনকেই নিয়ে যাবো ইউরোপে। তোমরা একজনও এদেশে থাকার মতো মানুষ নও। আরে, এটা একটা দেশ হলো? আমি কিন্তু এ ব্যাপারে সত্যি খুব সিরিয়াস। দেশটা খুবই ছোট—অন্তত তোমাদের জন্যে। তোমরা এখানে দিনদিন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছো। শোনো হে মিস্টার মিলার। যতোরাজ্যের আলতু ফালতু ম্যাগাজিনে ওসব ছাই পাশ লেখা লিখে লাভটা কি হচ্ছে তোমার? তুমি লিখবে বই। লিখতেই যদি হয়, বই লেখো। কেন তা লিখছো না?'

পরদিন জুনালেস্‌কা হ্রদ আর ওয়েনসভিল, দু'জায়গাতেই বেড়াতে নিয়ে গেলাম ক্রনস্কি এবং তার বউকে। কিন্তু স্থান দুটো তাদের কাউকে মোহিত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

'দেখেছো, কি চমৎকার জায়গা?' আমি বললাম ফেরার সময়।

'যতো চমৎকারই হোক, তুমি থাকবে না এখানে।' সে বলে উঠলো। 'তুমি এখানে মানানসই নও।'

'মানানসই নই? কি যে বলো।' আমি বললাম। মনে মনে অবশ্য চিন্তা করি, তাই তো, আমি তাহলে কোন্ দেশের জন্যে মানানসই? ফ্রান্স? হয়তো বা তাই। অথবা তা নয়। পছন্দ অপছন্দের কথা যদি ওঠেই, আমি বলবো স্পেনের

কথা। স্প্যানিয়ার্ড, এমন কি রাশিয়ান হলেও আমি খুব সম্ভব খুশি হতাম।

যাই হোক, সময় ফুরিয়ে গেলে, সস্ত্রীক ক্রনস্কি বিদায় নিয়ে চলে গেলো আমাদের কাছ থেকে। মোনা এবং আমি এ ব্যাপারে একমত হলাম যে আমার বন্ধুদের মধ্যে ক্রনস্কিই আমার সবচেয়ে আপন। ক্রনস্কির দেয়া পঞ্চাশ ডলারে আমরা ঋন মুক্ত হলাম। তারপর আশা করে রইলাম, আরো ক'টা টাকা সে পাঠিয়ে দেবে, যাতে আমরা অন্ততঃ নিউ ইয়র্কে ফেরার গাড়ি ভারাটা দিতে পারি। আমি অনেক কষ্টে একটা নিবন্ধ লিখলাম। আরো একটা শুরু করতে গিয়েই দেখি, আসছে না। তখন একরাশ চিঠি লিখে যত্রতত্র পোস্ট করলাম। যেসব লোক আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলো কিংবা সহানুভূতি জানিয়েছিলো, তাদের কাছে একটু সহায়তার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলাম। লিখলাম একটি পত্রিকার সম্পাদককেও, যিনি একদা আমাকে সহকারী সম্পাদকের পদে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। ও'মারার কাছে পরামর্শ চাইলাম। কিন্তু আমার ওপর তাকে খুব প্রসন্ন বলে মনে হলোনা। ক'টা টাকারও দরকার ছিলো আমার। কিন্তু ও'মারার থমথমে মুখ দেখে ওর কাছে টাকা চাইবার প্রবৃত্তি হলোনা।

চিঠিপত্রের দরুন অতি সামান্য হলেও কিছু অর্থাগম হলো। অবশ্য ক্রনস্কির কাছ থেকে কোনো জবাব পাইনি এ পর্যন্ত।

বাড়িঅলার নম্র ব্যবহার, মিস্টার রাউলিনের আশ্বাস এবং প্রতিবেশী ম্যাথুজের বহুমুখী সহায়তার পরও কয়েক সপ্তাহের ভেতর সাহস হারিয়ে ফেললাম আমরা। একদিন খুব ভোর-বেলা শয্যাত্যাগ করলাম আমরা। সারারাত জেগেই ছিলাম। দু'হাতে সামান্য দুটো ব্যাগ নিয়ে, জুতো জোড়া হাতে ধরে, পা টিপে টিপে ঘর থেকে চোরের মতোই বেরিয়ে এলাম আমরা। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে গেলাম আমরা। তারপর গাড়িতে উঠলাম। দুপুর নাগাদ আমরা পৌঁছলাম উইনস্টন সালেমে। সন্ধ্যার দিকে এলাম ডারহামে। বাবাকে তার করেছিলাম টাকার জন্যে। টাকাটা এই ডারহামেই আমার নামে পাঠাবার কথা বলেছিলাম।

টেলিগ্রাম ঠিকই এসেছে। কিন্তু টাকা আসেনি। টেলিগ্রামের প্রতিটি শব্দ যেন কান্না জড়ানো—'দুঃখিত খোকা। এমনকি ব্যাংকেও নেই।' আমি যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বো এরকম অবস্থা হলো আমার। নিজেদের কথা ভেবে নয়, কী দুঃসহ অবস্থায় বাবা জীবন যাপন করছে, সেই কথা চিন্তা করে। না জানি কতো কষ্ট হচ্ছে তার।

একটি অচেনা লোক স্যাণ্ডুইচ আর কফি খাওয়ালো আমাদের। খিদেয় যেন মারা যেতে বসেছি। কোনো সাধারণ মানুষও বুঝি আমাদের মতো অনাহারে নেই। পথের দূরত্ব আমাদের ক্ষুধা আর হতাশাকে যেন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা হাঁটছি আর হাঁটছি। কিন্তু নিউইয়র্ক আর কতোদূর? পথ-

শ্রমে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম হাইওয়ের পাশে। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামলো আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে। অবিশ্বাস্য মনে হলো কথা ক'টি—'একটা লিফ্‌ট চান কি?' গাড়িতে ছিলো এক দম্পতি। যাচ্ছে দু'ঘণ্টা দূরত্বের এক ছোট শহরে। যুবকটির কথার টানে মনে হলো সে আলাবামার মানুষ। যুবতীটি আরকানসাসের। খুবই হাসিখুশি প্রাণবন্ত মনে হলো দু'জনকেই। মনে হলো, এই পৃথিবীটা নিয়ে তারা ভাবে।

হঠাৎ রাস্তায় খারাপ হয়ে পড়েছিলো গাড়িটা। ফলে দুঘণ্টার পথ পার হতে আমাদের লাগলো পাঁচ ঘণ্টা। এই বিলম্বে একটা উপকার হলো আমাদের। ওদের সঙ্গে বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গতা জমে গেলো আমাদের। নিজেদের সম্পর্কে বিস্তারিত খুলে বলেছিলাম আমরা। যা ওদের দু'জনেরই অন্তর স্পর্শ করলো। মেয়েটির কথা আমি কোনো দিনও ভুলতে পারবো না। গাড়ি থেকে প্রায় দৌড়ে নেমে সে আমাদের স্নানাহার আর বিশ্রামের যে ত্বরিৎ বন্দোবস্ত করে ফেললো, তা কেবল কল্পনা করাই সম্ভব। রাত তখন প্রায় তিনটে—যখন আমরা মহার্ঘ খাদ্য আর পানীয় গ্রহণের পর ফুরফুরে পোশাকে শুতে গেলাম ধবধবে বিছানায়।

পরদিন দুপুর বেলায় ঘুম ভাঙলো আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলাম বিশাল এক ব্রেকফাষ্ট। তারপর গৃহস্বামী আমাকে নিয়ে গেলো বাড়ির পেছনে। সেখানে আঙিনার ওপর ইত-

স্তুতঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে বহু গাড়ির ভাঙ্গা টুকরো। ভাংগা গাড়ির ব্যবসা তার। কিন্তু বড্ড সুখী মানুষ। কেন যে ওরা আমাদের কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে অনুরোধ করলো, তা মাথায়ই এলো না আমার।

যখন বিদায় নিচ্ছি, মেয়েটি জড়িয়ে ধরলো মোনাকে। প্রায় জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলো কয়েকটা নোট। একই সময় ওর স্বামী আমার বগলের নিচে ঠেলে দিলো এক কার্টন সিগারেট। তারপর গাড়ীতে করে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে দিলো আমাদের। বিদায় নেবার সময় দেখলাম, ওদের দু'জনেরই চোখ ছলছল করছে।

বাসে চেপে ওই দিনই ওয়াশিংটন পৌঁছলাম আমরা। রাত্রে ওঠলাম রিচমণ্ডের স্টিমারে। কিন্তু সেখানেই বিপর্যয় ঘটে গেলো একটা। মেয়েটার দেয়া ডলার সুদ্ধ মোনার হাত ব্যাগটা অদৃশ্য হয়ে গেছে হঠাৎ। কেউ কি চুরি করেছে সেগুলো? আমরা হতাশ হলেও খুব একটা ভেংগে পড়লাম না। কেননা বহু পথ অতিক্রম করে, আমরা এখন গন্তব্যের অনেকটা কাছাকাছি।

স্টিমার থেকে নেমে আবারও খাবার সময় হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু পকেট ফাঁকা। দিশেহারার মতো আমরা ঢুকে পড়লাম একটা গ্রীক রেস্তোরাঁয়। পেটপুরে খেলাম। তারপর মালিককে খুলে বললাম সবকথা। বললাম, আমরা ভদ্র সন্তান। স্টিমারে সব কিছু খোয়া গেছে। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট।

কি করবো, মরিয়ার মতো এসে খেতে বসেছি। কিন্তু লোকটা আমাদের কথা বিশ্বাস করলো না বোধ হয়। উল্টো খবর দিলো পুলিশে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মোটর সাইকেলের ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ তুলে হাজির হলো একজন পুলিশের লোক। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের বলবার কিছু আছে কি?' আমি বললাম, 'সে যদি খরচা দেয়, আমি নিউইয়র্কে একটা টেলিগ্রাম করতে পারি টাকার জন্যে।' পুলিশটা রাজি হলো। তার এই সৌজন্যমূলক আচারণ আমরা আশাও করিনি। আমরা আভাস দিলাম সকাল নাগাদ টাকা এসে পড়বে আমাদের। পুলিশটা আমাদের নিকটবর্তী একটা হোটেলে নিয়ে তুললো। তারপর গ্রীকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি জিম্মি রইলাম আপনার টাকার।' আমরা একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে, মাত্র কিছু সংখ্যক হলেও?

আমি ডলারিকের কাছে টেলিগ্রাম করলাম। পুলিশটি হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিলো আমাদের। বললো, সকালে আসবে আবার। আমি ভেবে বিস্মিত হলাম, নিউইয়র্কের পুলিশ হলে কি এতো সহজে রেহাই দিতো আমাদের? মোটেও না।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম এলো না আমার। মোনারও নয়। কেননা আমরা জানতাম, টাকা আসবে না। মাঝরাত্রি নাগাদ ফন্দি আঁটলাম পালাতে হবে। যদিও কাজটা বেশ কঠিন। গ্রীক রেস্তোরাঁটা খোলা থাকবে অনেক রাত অবদি। তাছাড়া

হোটেলের নাইট-ক্লার্ক বসে আছে হল ঘরের সামনেই। এদের চোখ এড়িয়ে হোটেল থেকে বাইরে বেরুনো সহজ নয়। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখান থেকে রাস্তাটা মাত্র ছ'ফুট নিচে। ঠিক করলাম, খুব ভোরবেলা এই জানালা টপকেই পালিয়ে যেতে পারবো।

যে কথা সেই কাজ। সূর্যোদয় দেখলাম আমরা হাইওয়েতে পৌঁছে। শহর থেকে জায়গাটা মাইল দুয়েক হবে। একজন উকিলের লিফট পেলাম আমরা। আমি একজন লেখক এবং টাকা পয়সা চুরি হয়ে গেছে শুনে বিশ ডলার ধার দিলেন আমাকে। অবশ্য একথা মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না, টাকাটা খরচা করার পর তা শুধিয়ে দেবার কথাটা মনে না রাখলেও চলবে। বিদায়ের সময় বললেন, 'জানেন, আমিও একজন লেখক হতে চেয়েছিলাম?' আশ্চর্য! দুনিয়াতে কতো রকম মানুষই না আছে!

মাঝরাতে আমরা পৌঁছলাম নিজেদের শহরে।

প্রথমেই হানা দিলাম ক্রনস্কির বাড়িতে।

'এই যে সোনার চাঁদেরা।' ক্রনস্কি বলে উঠলো, 'আমার কথা বাসি হলে ফললো তাহলে। সত্যিই ফিরে এসেছো তোমরা? তবে হ্যাঁ স্যার, এইখানে ঘাঁটি গাড়া চলবে না। বড়ো জোর আজকের রাতটাই কাটাতে পারো। তা, খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমাদের? আমাকে খুব সকালবেলায় উঠতে হবে। বাসায় কিন্তু ধোয়া তোয়ালে নেই। চেয়ে

বোসোনা আবার। খুব একটা ভালো বিছানা পাচ্ছোনা শোবার জন্যে। ব্রেকফাস্ট কিন্তু বিছানায় পাবে না। উঠে গিয়ে খেতে হবে।' এক নিঃশ্বাসে সবগুলো কথা বলে উঠলো ক্রনস্কি। ভুক্তাবশেষ আর ডাক্তারী বইগুলো সরিয়ে ময়লা চাদরের ওপর শুয়ে পড়লাম আমরা। চাদরের ওপরকার রক্তের ছিটে নিয়ে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করলাম না আর।

কী একটা বৌদ্ধ পত্রিকায় যেন পড়েছিলাম লেখাটি। তাতে একটা জায়গায় বলা হয়েছে, 'চাওয়া মাত্রই সবকিছু পেলে প্রকৃত সুখ পায়না কোনো মানুষ। অর্জনে যদি সমস্যা, ভোগান্তি আর রহস্য না থাকে তবে তা বৈচিত্রহীন।' পড়ে হেসেছিলাম আমি। তারপর উঠে পড়েছিলাম বিছানা থেকে।

সোনার খনির খোঁজে ঘোরাঘুরি না করে এবার মাটির দিকে তাকানো দরকার আমার। একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে স্বাভাবিক জীবন না করলেই নয় আর। রঙধনুর উৎস খুঁজতে বেরুবো না আর আমি। এমন এলোমেলো জীবন যাপনের কোনো অর্থ হয়? স্বাভাবিক কোনো চাকরি নিলে দৈনন্দিন জীবনে আর কোনো সমস্যাই থাকে না আমাদের। সব প্রয়োজনই মিটে যায়। আমি জানি, মোনা আমার এই সিদ্ধান্তের খবর শুনে আঘাত পাবে। এটা তার প্রতি বিরাট একটা বিশ্বাসঘাতকতাও হবে নিঃসন্দেহে।

'এসব কি বলছো?' সবকথা শুনে মোনার প্রশ্ন।

'ঠিকই বলছি!' আমি বললাম, 'চাকরি আমাকে করতেই হবে।'

'তাহলে আমিও নেবো একটা চাকরি।' বললো সে। এবং সেইদিনই ওয়েট্রেসের কাজ নিলো 'আয়রণ ক্যালড্রনে।'

মোনাকে আমার কথা দিতে হয়েছিলো এই যে, চাকরি খুঁজতে বেরিয়ে যেখানেই যাই, যা কিছুই করি দু'বেলা যেন ওই আয়রণ-ক্যালড্রনে খেয়ে নিই। কিন্তু আমি লাঞ্চ খেতে যাই একবার। কেননা মোনা যেভাবে আমার জন্যে টেবিলে বসে অপেক্ষা করে, তার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারিনা। কিন্তু কোনো অফিসে নিয়মিত একটা চাকরি পাওয়া আজকাল খুব কঠিন ব্যাপার। অবশ্য প্রকাশনার জগতে ভালো কাজ পেতে পারি আমি। কিন্তু 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার জন্যে আবারো কোনোরকম কাজ করতে ইচ্ছে হয়না আমার। অন্য কোনো এন সাইক্লোপিডিয়াতে কাজ করা যায় কিনা ভাবছিলাম। পেয়েও গেলাম খবর একটা। সেলস্ ম্যানেজার—অর্থাৎ যাঁর কাছে আমি চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম—তিনি খুব সহজেই আমাকে প্রভাবিত করতে পারলেন যে, তাদেরটাই বাজারের সেরা বিশ্বকোষ। যাহোক, কাজটা জুটেই গেলো। তিনি এক গাদা কাগজপত্র ভর্তি একটা ঢাউস ব্রিফকেস তুলে দিলেন আমার হাতে। নমুনা-পৃষ্ঠা আরকি। এক কথায় এক বিশাল বিশৃংখল ব্যাপার। আমি বাসয় ফিরেই বসে গেলাম কাজে। আমি তো কারো মুখের ওপর 'না'

বলতে শিখিনি।

আমি প্রথম দিনই দু'টি সেট বিক্রী করলাম, যথেষ্ট ভালো কমিশনে। এতো কমিশন আগের কোনো বিক্রীতে থাকেনি। আমার প্রথম শিকার ছিলো একটা ইহুদী। সেটটা তো সে কিনলোই। উপরন্তু একই টেবিলে বাড়ির সবার সঙ্গে বসে লাঞ্চ করতে বাধ্য করলো এবং এমন কিছু নাম-ঠিকানা দিলো, যাদের কাছে খুব সহজেই আমি এই আলগা-পাতার অভিনব বিশ্বকোষ বিক্রী করতে পারি। পরদিনই বিক্রী হয়ে গেলো তিনটি সেট। বলা বাহুল্য, ওই ইহুদী লোকটার তালিকা অনুযায়ীই। সেল্‌স ম্যানেজার মনে মনে খুশি হয়েছেন বলেই মনে হলো। কিন্তু মুখে তা সরাসরি প্রকাশ করলেন না। বললেন, এটা কাকতালীয় ঘটনা। হঠাৎ করেই কাজের শুরুটা এমন চমৎকার হয়েছে। এ ধরণের আকস্মিক-সাফল্যে মাথা ঠাণ্ডা না-রাখলে বোকামি হবে। তাছাড়া দু'তিনটি কেন, দিনে পাঁচ ছ'টি সেট বেচতে পারলে তবেই না বাহাদুরী। তিনি আরো জানালেন, তাঁদের নাকি এমন লোকও আছে, যে দিনে বারোটি সেট বিক্রী করে!

'গাঁজাখুরি গল্পের আর জায়গা পাওনি!' কথাটা অবশ্য মনে মনেই বললাম আমি। যে লোক দিনে বারো খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া বেচবার ক্ষমতা রাখে, সে এনসাইক্লোপিডিয়া বেচবে কেন, গোটা ব্রুকলিন ব্রীজটাই বেচে ফেলতে পারে।

বেশ নিষ্ঠাভরেই চাকরি করছি আমি। কাজের গতিকেই আমি

প্যাসাইক, হকোবেন, ক্যানারি এমনকি ম্যাস পেথের মতো অখ্যাত শহরেও যাই। প্রকাশক স্বয়ং আমার ওপর প্রসন্ন। একদিন ডেকে বললেন, 'আমার সঙ্গে লেগে থাকো। উন্নতি হবে তোমার।' আমার কথা বার্তার ঢং নাকি তাঁর খুব পছন্দ। শিগগীরই নাকি মস্ত বড়ো একটা প্রদর্শনী হবে তাঁর প্রকাশনা-সংস্থার। তিনি চান, সেখানে হাজির থাকি আমি। তিনি এমন আভাসও দিলেন যে আস্তে আস্তে ব্যবসার একটা বড়ো অংশের দেখা শোনা করার দায়িত্বও ন্যস্ত হবে আমার ওপর।

একথা শুনে আমি মুখে বললাম, 'চমৎকার হবে তাহলে।' কিন্তু মনে বললাম 'ছুত্তোর। কে নেবে ব্যাটা তোর ব্যবসা-দারীর গুরুভার?' আমি তো 'সফলতা' শব্দটাকেই ঘেন্না করি। দিনে একটা সেট বিক্রী করতে পারলেই তো ঢের। অন্ততঃ আমার নিজের পক্ষে। আমি দিনে একটি বা তিনটি সেট বিক্রী করলেও এই চাকরি থেকে কেবল গ্রাসাচ্ছদনই চল-ছিলো, অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে মোনা একা যা রোজগার করছিলো, তা আমাদের দু'জনের জন্যে যথেষ্ট। বেতন পাচ্ছে সে ভালোই। বখশিস যা মিলছে তা-ও নেহাৎ কম নয়। প্রায়ই সে নানারকম উপহার উপঢৌকন, টাকা পয়সা নিয়ে আসে। সেই পুরনো খেলা। এখানেও সেই ভক্তদের ভীড়। 'প্রেমিক' মা-বলে এদেরকে মোনা 'ভক্ত' বলতেই ভালোবাসে। কেন যে তার অতো ভক্ত জুটে যায়, আমি

ভেবে পাইনা। আমি তো বেশ জানি, ভক্তরা যতোই তড়-পাক, মোনা তাদের দিকে চেয়েও দ্যাখেনা।

কেবল ক্লদ নামে একটা ছোকরার কথা মোনা মাঝে মাঝে বলে। ছেলেটা নাকি তার অন্ধ ভক্ত। অথচ বয়েস তার ষোলো বছরের একটা দিনও বেশি নয়।

'তোমাকে একদিন আলাপ করিয়ে দেবো।' বলে মোনা। 'জানো, সে চল্লিশ বছরের মানুষের চেয়ে পরিনত বুদ্ধির অধি-কারী। সে প্রায় যীশু খ্রীস্টের মতোই।'

জবাবে আমি অট্টহাসি উপহার দিই মোনাকে।

'হাসছো তো?' মোনা বলে, 'হাসো। তবে ওর সঙ্গে আলাপ হলে তোমার সুর পাল্টে যাবে।'

শুনেছি, চমৎকার ওই নাভাজো-আংটি আর ব্রেসলেটটা ওকে দিয়েছে ক্লদ নামধারী ওই ছোকরাটাই। গোটা একটা গ্রীষ্মই নাকি ক্লদ কাটিয়ে এসেছে নাভাজোদের সঙ্গে। সে ওদের ভাষাও নাকি শিখে ফেলেছে। জীবনের বাকী অংশটা নাভা জোদের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়াই ক্লদের ইচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম, ছোড়াটার বাড়ি কোথায়? তার মানে আসলে সে কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু মোনা তা জানেনা। তবে ব্রনস্ক থেকে এসেছে বলেই মনে হয় নাকি তার।

'ইহুদী নাকি ছোকরাটা?'

এবারও মোনা অজ্ঞতা প্রকাশ করে। বলে, 'ওর মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। কখনো মনে হয় ইণ্ডিয়ান রক্ত

বইছে ধমনীতে। কখনো বা আবার খাঁটি আর্য বলে অনুমতি হয়। যখন যেখানে যেভাবে থাকে, তখন তেমনি মনে হয় তাকে।'

'খুব সম্ভব রাশিয়ায় জন্মেছে ও তাহলে।' আমি বললাম। এবং আমাকে বেশ অবাক করে দিয়েই মোনা বললো, 'সে অনর্গল রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে—অবশ্য সেসব কথার কোনো অর্থ হয় কিনা, আমি জানি না। কেবল তাই নয়, সে অন্যান্য ভাষাও জানে—আরবী, তুর্কী, আর্মেনীয়, জার্মান, পর্তুগিজ, হাঙ্গেরীয়,---'

'ওহ্—হাঙ্গেরীয় নয়।' আমি বললাম, 'রুশ, ঠিক আছে, তুর্কীও সম্ভব। কিন্তু আমি নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করবো না যে, সে হাঙ্গেরীয় ভাষায় কথা বলতে পারে।'

'বেশ তো। এক রাতে এসে সন্দেহ ভঞ্জন করো।' মোনা বলে উঠলো, 'কিন্তু হাঙ্গেরীয় ভাষা তুমিও তো জানো না। তাহলে ধরবে কি করে, ও পারে কি পারেনা।'

'মানলাম। কিন্তু এটা আমি বেশ জানি, হাঙ্গেরীয় ভাষা যে জানে, সে যাদুকর ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ভাষা এটা। অবশ্য হাঙ্গেরীয় ছাড়া অন্যদের জন্যেই। হতে পারে ক্লদ খুব প্রতিভাবান। কিন্তু একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলোনা যে সে হাঙ্গেরীয় ভাষায় কথা বলতে পারে।' আমি একদমে বললাম কথাগুলো।

কিন্তু আমার কথায় তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে

হলোনা। কেননা সে আগের সুরেই বলে উঠলো, 'তোমাকে যে কথা বলতে ভুলে গেছি, তা হলো, সে সংস্কৃত, হিব্রু.....'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে--' বললাম আমি, 'আমি তার কাছে যাবো। গিয়ে নিজের কানেই শুনে আসবো তার ভাষার নমুনা। অন্ততঃ ছ'টা ভাষা না-শোনাতে পারলে আমি তৃপ্তি পাবো না কিন্তু।'

মোনা এমন দৃষ্টিতে আমার দিক তাকালো, যেন সে করুনা করছে আমাকে। বলছে; 'হায়, নির্বোধ সন্দেহ প্রবণ।' তার মুখের হাসি দেখে গা জ্বলে গেলো আমার।

'তুমি ওভাবে হাসছো কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হাসছি একথা ভেবে যে, যদি আমি বলি, মানুষকে আরোগ্য করার এক অদ্ভুত ক্ষমতাও তার আছে, তখন তুমি কি ভাববে?'

'তুমি তার ওই ক্ষমতার খবর পেলে কোথায়? নিজের চোখে কাউকে আরোগ্য করতে দেখছো কি?'

মোনা কোনো কথা বললো না। আমি ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বললাম, 'ছোকরা কি মাথাব্যথা সারাতে পারে?'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলো না মোনা। একটু পরে বললো, 'সে ক্যান্সার সারিয়েছে। অবশ্য এতে যদি তার কৃতিত্বের কোনো পরিচয় মেলে।'

রাগে জ্ঞানশূন্যের মতো লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'তুমি কি সত্যি একটা নির্বোধ? তুমি কি বলতে চাও, ছোক-

রাটা মরা মানুষও জ্যান্ত করতে পারে ?'

স্মিত হাসি ফুটে উঠলো মোনার মুখে। ধীর কণ্ঠে সে বললো, 'শোনো ভ্যাল, তুমি বিশ্বাস করো চাই না করো, সে তা-ও করেছে। নাভাজোদের ওখানে। তাই তো, ওরা ওকে অমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে।'

'ঢের হয়েছে বাপু।' আমি বললাম, 'আজ যথেষ্ট হয়েছে। এখন প্রসঙ্গটা পাল্টে ফেলা যাক। এ ব্যাপারে তুমি যদি আর একটা কথাও বলো, আমি মনে করবো তোমার মাথা খারাপ হচ্ছে আস্তে আস্তে।'

কিন্তু এর পর মোনা যা বললো, তাতে আমি প্রায় লাফিয়েই উঠলাম।

'ক্লদ বলেছে তোমার সঙ্গে কথা আছে ওর। সে তোমার ভেতর বাইরের সমস্ত কিছু জানে। সে বলেছে, তোমার ভবিষ্যত নাকি অত্যন্ত উজ্জ্বল। মস্তবড়ো একটা কীর্তি স্থাপন করতে তোমার খুব একটা দেরী নেই। একদিন তুমি হবে বিশ্ববিখ্যাত মানুষদেরই একজন। ক্লদের মতে, তুমি এখন অন্ধের মতো জীবন যাপন করছো। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে তুমি অন্ধ, বোবা ও বধির।'

'ক্লদ বলেছে একথা ?' অনেকটা থিতিয়ে এসেছি আমি এবারে। 'ঠিক আছে। ওকে বোলো, ওর সংগে কথা বলবো আমি।' আমি বললাম। 'তা কালকে রাত্রে যদি যাই, কেমন হয় ? কিন্তু তোমাদের ওই রেস্তোর'াঁয় অবশ্যই নয়।'

আমার পূর্ণ-আত্মসমর্পন উপভোগ করতে করতে মোনা বললো,

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও আমি এমন নিরিবিলি একটা জায়গা ঠিক করবো, যেখানে নিরিবিলে কথাবার্তা বলতে পারবে তোমরা।'

কিন্তু মোনা দিন, ক্ষণ ও স্থান ঠিক করলেও, চাকরির কারণে আমি ক্লদের সংগে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হলাম। খোলা পাতা-বিশ্ব কোষ বিক্রীর ব্যাপারে আমাকে যেতে হয়েছিলো শহরের শেষ প্রান্তে। সেখানে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো একটা নিগ্রো-সম্মেলনে হাজির হতে হয়। সম্মেলনের শেষে নিগ্রো নেতার বাড়িতে ডিনার খেয়ে তবেই ফিরতে পেরেছি বাসায়। কাজেই ক্লদের সংগে দেখা করবো তেমন সময় আদপেই ছিলোনা হাতে।

পরদিন সকাল। পাইন আপেল স্ট্রীটের এক ককি শপে ব্রেক-ফাস্ট সেরে নিচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ পিঠের ওপর কারো হাতের ভার অনুভব করলাম। পেছন থেকেই একটা নরম গলার প্রশ্ন শুনলাম, আমি হেনরী মিলার কিনা। আমি জানতাম, প্রশ্নকর্তা ক্লদ ছাড়া অন্য কেউ নয়।

'শুনেছিলাম, আপনি সাধারণত এই রেস্তোরাঁতেই ব্রেক-ফাস্ট করেন।' সে বললো, 'কাল রাতে আপনি না-আসায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছি মনে মনে। আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলো, যার সঙ্গে আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারতাম আপনাকে। সে এসেছে তেহরান থেকে।'

আমি ক্ষমা প্রার্থনার পর আমার সঙ্গে প্রাতরাশে অংশ নিতে

অনুরোধ করলাম তাকে। এটা নিশ্চয় হবে তার দ্বিতীয় ব্রেক-ফাস্ট। কিন্তু ওর মতো ছেলের জন্যে দুটো তিনটে ব্রেক-ফাস্ট কিছুই নয়।

সে অনেকটা উটের মতো। যখন যেখানে সুযোগ পায় উটের মতোই ট্যাঙ্ক ভরে নেয়।

'আপনি তো মকররাশির জাতক, তাই না?' ক্লদ জিজ্ঞেস করলো, 'ডিসেম্বরের ছাব্বিছ তারিখ, ঠিক নয়? এই ধরুন, দুপুর নাগাদ এসেছিলেন আপনি দুনিয়ায়।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'আমি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে খুব একটা জানিনা।' সে বললো, 'এটা আমার প্রস্থান করার কেন্দ্র একটা। আমি বাইবেলের যোশেফের মতো, আমার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা। মহাপুরুষ-সুলভ স্বপ্নাবেশ আরকি। তবে তা হয় কখনো কখনো। সব সময় নয়।'

আমি প্রশ্রয়ের হাসি হাসলাম।

'শিগগীরই আপনি পর্যটনে বেরুবেন। এই ধরুন, দু'এক বছরের মধ্যেই। গুরুত্বপুর্ণ যাত্রাই বলতে পারেন আপনি একে। আপনার জীবনধারা এতে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।' ক্লদ একটু থামলো। তাকালো জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। যেন ধ্যানস্থ হচ্ছে। 'কিন্তু এ মুহূর্তে ওটা ততো জরুরী বিষয় নয়। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি অন্য কারণে।' সে আবার একটু থামলো। 'আপনার একটা

ফাঁড়া দেখতে পেয়েছি আমি। আপনার যাত্রা যোগের আগে আগেই মস্ত একটা বিপদের আভাস দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনাকে সমস্ত সাহস সংহত করে এই দুর্ঘটের মোকাবেলা করতে হবে। আমি আপনার পূর্ব-পরিচিত নই। তবু বলছি, আপনার পাগল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।'

'ক্ষমা করবেন,' আমি বললাম, 'আপনি এত কথা জানলেন কিভাবে, প্রশ্ন করতে পারি কি?'

ক্রদ তার নিজের ভঙ্গীতে হাসলো। তারপর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললো, 'আপনাকে যে আমি অনেক দিন ধরেই চিনি। তবে বাস্তবে নয়-স্বপ্নের মাধ্যমে। আপনি বারবার হানা দেন আমার স্বপ্নের ভেতর। অবশ্য মোনার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে পর্যন্ত আমার জানা ছিলোনা যে, ওই লোকটাই আপনি। পরে দেখলাম, হ্যাঁ ওটা আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।'

'আশ্চর্য!' আমি অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করলাম।

'খুব বেশি আশ্চর্য ব্যাপার নয় কিন্তু।' ক্রদ বললো, 'এরকম অভিজ্ঞতা কারো কারো থাকে। যেমন একবার চীনের এক ছোট্ট গাঁয়ে কাঁচা রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ এক বুড়ো এসে খপ্ করে আমার হাত ধরলো। বললো, 'আমি জানতাম তুই আসবি। ঠিক সময় মতোই এসে-ছিস তুই।' বুড়োটা ছিলো যাদুকর। ব্ল্যাক আর্টের চর্চা করতো।'

'তুমিও কি একটা মনোবিশ্লেষক?' আমি রসিকতা করে বলি।

'না, আমি যাদুকর নই' বললো ক্লদ, 'অতীন্দ্রিয় এই ক্ষমতা আমি পেয়েছি আমার জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গেই।'

'কিন্তু এতে তোমার খুব লাভ হয়নি বোধ হয়!'

'ঠিক বলেছেন।' ক্লদ বললো, 'কিন্তু অন্যদের সাহায্য করতে পারছি আমি। অবশ্য তাদেরকেই সাহায্য করি আমি, যারা সাহায্য চায়।'

'আমাকে সাহায্য করতে চাও কি?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তোমাকে? অবশ্য যদি কিছু মনে না করো।'

'স্বচ্ছন্দে। মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তোমার জন্ম কোথায়? তোমার মা বাবাই বা কে?' ক্লদ সরাসরি আমার চোখের দিকে চাইলো। 'সেটাই আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।' সে বললো, 'হয়তো আপনিই আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। আপনি আমার স্বপ্নের মধ্যে যেভাবে আনাগোনা করেন, তাতে মনে হয়, আমার জীবনে আপনি পালন করতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।'

'স্বপ্নের কথা বারবার বলছো তুমি।' আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি তোমার স্বপ্নের ভেতর কীভাবে হাজির হই? বলতে

পারো ?'

'অনেক রকম ভাবে।' রুদ বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গেই, 'কখনো পিতার মতো, কখনো বা শয়তানের রূপ ধারণ করে আবার কখনো বা দেবদূতের চেহারায়। আপনি যখনই আসেন, এক ধরনের অলৌকিক সংগীত ভেসে আসে যেন কোথা থেকে।'

একথার পর আমি কি বলবো, তা ভেবে পেলাম না।

'আপনি নিশ্চয় জানেন,' রুদ বললো, 'অন্যদের ওপর আপনার প্রভাব বিস্তারের শক্তি আছে। এ শক্তি সবার থাকেনা কিন্তু। তবে এমন দুর্লভ শক্তির অপব্যবহার করেন আপনি। আপনার প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তাদের ওপর আপনি খাপ্পা হয়ে ওঠেন কেন, জানিনা।'

'তোমার অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই মনে হচ্ছে আমার আমি বললাম।

রুদ তার নিজের ভংগীতেই বলে চলেছে, 'আপনি একজন বিশ্বাসী মানুষ। কোনো অমংগল আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না কোনোদিনও। আপনি ইচ্ছে করলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান দিয়েও হেঁটে যেতে পারবেন। হ্যাঁ, সেভাবেই আপনি তৈরী। আপনার সংগে আমার এই যোগাযোগ কিন্তু আকস্মিক নয়। আমরা দু'জনেই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমাদের প্রকৃত মা বাবাকে। আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন, আমার জন্ম কোথায় ? আমি শুনেছি, ব্রনস্কের

রাস্তার পাশে আমার মা বাবা আমাকে ফেলে দিয়েছিলো। আমার সন্দেহ আছে, আমার মাবাবা যারাই হোক না কেন, তারা নিশ্চয়ই এসেছিলো এশিয়া থেকে। খুব সম্ভব মংগোলিয়া থেকেই। আপনার চোখের দিকে তাকালেও কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার শরীরে বইছে মঙ্গোল রক্তের ধারা। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এরকম সন্দেহের কথা আমার আগে আপনাকে কেউ বলেনি ?'

'মঙ্গোল রক্তের কথা বলছো ?' কথাটা অবশ্য মনে মনেই আওড়ালাম আমি। 'অবশ্যই আমি এরকম কথা আগেও শুনেছি। এবং সব সময় একই ধরনের লোকদের মুখেই সবাই বলেছে, তুমি মঙ্গোলদের উত্তর পুরুষ। আমি স্বীকার করি কি না-করি তাতে কারো কিছু যায় আসেনি। আমার ললাটে যেন ছাপ মারা আছে যে আমি তাদেরই একজন।'

মঙ্গোল ঘটিত এসব ব্যাপার আসলে যতটা না জাতিগত তার চেয়ে বেশি প্রতীকধর্মী। মঙ্গোলরা ছিলো গোপন বার্তার বাহক। অতীতের প্রত্যান্ত এলাকায় পৃথিবী ছিলো যখন একটাই, এবং প্রকৃত শাসকরা যখন নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতেন, মোঙ্গলরা তখন ছিলো সোচ্চারভাবে উপস্থিত। সাধারণ মানব গোষ্ঠী থেকে তাদের স্বতন্ত্র চিহ্নিত হয় কেবল তাকানোর ভঙ্গীতে।

ক্রুদের চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এক অনন্ত গহবর অবলোকন করছি। মিনিট দুয়েকের মতো আমাদের

মধ্যে কোনো বাক্যালাপ হলোনা। অস্বস্তির কিংবা বিরক্তির শিকার হলাম না আমরা কেউই। দু'টি টিকটিকির মতো, আমরা দু'জন পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কেবল। পরস্পরকে অবগত হবার মোঙ্গল-চাহনি মেলে।

নিরবতা ভাংলাম আমি। বললাম, সে আমাকে ডিয়ার স্লেয়ারকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। সেই সংগে ড্যানিয়েল বুন-কেও। তার সংগে আমার নেবুচাডনেজারেরও কিছুটা পরশ।

সে হাসলো, 'অনেক ঘটনাবহুল পেরুতে হয়েছে আমাকে। যেমন নাভাজোরা আমাকে নাভাজো বলেই মনে করে। কে জানে, তাইই কিনা।'

'ব্রনস্কে তোমাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিলো, সেজন্যে নয়।' আমি বললাম, 'আমি নিশ্চিত যে, তোমার দেহে ইহুদী রক্ত আছে।'

'ইহুদীদের কাছেই মানুষ হয়েছি আমি।' ক্লদ বললো, 'আট বছর বয়েস অব্দি আমি রুশ আর ইদ্দিশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শুনিনি। দশ বছর বয়েসে আমি বাড়ি থেকে পালাই।'

'বাড়িটা কোথায়, মনে আছে তোমার?'

'ক্রিমিয়ার একটা ছোট গাঁয়ে। সেবাস্তপোল থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। আমার যখন মোটে ছ'মাস বয়েস, তখন আমাকে ওই মাটিতে এনে আবার পোঁতা হয়।' সে একটু থামলো। স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়ালো সে। তারপর বললো, 'যেদিন আমি প্রথম ইংরেজি শুনি, তখুনি ভাষাটাকে মনে

হয়েছিলো আপন।'

'আচ্ছা, কী কী ভাষায় কথা বলতে পারো তুমি, জানতে চাইলে কিছু মনে করবে কি?'

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন একটা হিসেব করে নিলো সে তারপর বললো, 'সত্যি বলতে কি, আমি ভাষাগুলো ঠিক বলতে পারিনা। তবে ওজন খানেক তো অবশ্যই বুঝি? কিন্তু এতে গর্বের কি আছে? ভাষার ওপর এক ধরনের স্বতস্ফূর্ত ভালো-বাসা আছে আমার।'

'কিন্তু হাংগেরীয় ভাষাটা আমি জানতে চাইলাম, 'এ ভাষাটা নিশ্চয়ই তুমি খুব সহজে শেখোনি?'

প্রশ্রয়ের হাসি দেখা গেলো ক্রুদের মুখে। বললো, 'হাংগেরীয় ভাষাকে লোকে কেন অতো কঠিন বলে বুঝিনা। এখানে, এই উত্তর আমেরিকাতেই ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এমন ভাষা প্রচলিত যা হাংগেরীয় ভাষার চেয়ে অনেক শক্ত। এবং তা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেই নির্নীত হতে বাধ্য তুর্কী, হাংগেরীয়, আরবী কিংবা নাভাজো ভাষা শিখতে চাইলে আপনাকেও হতে হবে ওদেরই একজন।'

'কিন্তু তোমার তো খুব অল্প বয়েস। তুমি অতো সময় পেলে কখন···

'বয়েস কোনো বিষয়ই নয়।' সে বলে ওঠে, 'বয়েসই জ্ঞান বুদ্ধির একমাত্র মাপ কাঠি নয়। এমনকি লোকে যে অভিজ্ঞতার কথা বলে, সে অভিজ্ঞতাও নয় আত্মার উৎকর্ষই হচ্ছে আসল

কথা।' বলতে বলতে রহস্যময় হাসি হাসলো ব্লুদ।
ব্লুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম পথে। টাইম-স্কোয়ার থেকে একটা খবরের কাগজ কিনলাম। গাড়ি ভর্তি কর্মব্যস্ত মানুষ। কিন্তু কারো ভেতরেই যেন প্রাণ নেই।
...সপ্তম দিনে ঈশ্বর কর্মবিরতিতে বিশ্রাম নিতে নিতে দেখলেন, সব কিছু ঠিক ঠাক আছে। ওটা তোমার পাইপের মধ্যে পুরে নাও এবং ধূমপান করো।...
...আমি পায়রাগুলোকে দেখছিলাম খুটিয়ে খুটিয়ে। সেখান থেকে চলে এলাম সিপাহী বিদ্রোহে। তারপর শুয়ে পড়লাম বাঙ্কের ওপর। কনি আইল্যাণ্ডে আসার আগে পর্যন্ত আর উঠলাম না। কিন্তু উঠেই দেখি, ব্রিফ কেসটা নেই। মানিব্যাগ-খানারও একই অবস্থা। কিছুই করার নেই। ট্রেনের ভেতর বসে থেকে ওভাবেই আবার ফিরে যেতে হবে আমাকে।
খিদে পেয়েছে আমার। প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু অবিশ্বাস্য উদ্দীপনাও বোধ করছি আবার। ভাবলাম, আমি আয়রণ ক্যালড্রনে খেয়ে নেবো। মনে হচ্ছে স্ত্রীর সংগে দেখাসাক্ষাৎ নেই আমার যুগ যুগ যাবৎ।

৬

এ তল্লাটে আয়রণ ক্যালড্রন একটা বিশিষ্ট নাম। বিশিষ্ট চেতনাও একে বলা যেতে পারে। নিকটদূরের বহু মানুষ এখানে খেতে আসে। এদের মধ্যে বাতিকগ্রস্ত এবং সাংঘাতিক দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোকও যে নেই, তেমন নয়।

মোনার কথা সত্য হলে, তার টেবিলেই সর্বাধিক সংখ্যক বিচিত্র প্রকৃতির ক্রেতার আমদানী হয় প্রতিদিন। প্রায় রোজই সে আমাকে শোনায় নতুন নতুন চিড়িয়ার কথা। প্রতিটি নতুন চরিত্রই আগেরটির চাইতে বেশি বিচিত্র।

তেমনি একটি আনকোরা চিড়িয়ার নাম আনাস্তাশিয়া। উড়ে এসেছে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে। বেশ কয়েক শো ডলার নিয়ে নিউইয়র্কে এসেছিলো মেয়েটি। কিন্তু টাকাগুলো ধোঁয়ার মতোই উড়ে গেছে। যে টাকাগুলো খরচ হয়নি তাও গেছে চুরি হয়ে। মোনার মতে মেয়েটি মারাত্মক রকম সুন্দরী। মাথায় তার লম্বা কালো চুল। বেগুনি-নীল চোখের তারা। চমৎকার গড়ন হাত এবং পায়ের। নিজেকে সে স্রেফ আনাস্তাসিয়া বলেই পরিচয় দেয়। তা, এই আয়রণ

ক্যালড্রনে সে এসেছে কাজের ধান্ধায়। একটা চাকরি চায় এখানে। মালিকের সঙ্গে মেয়েটার কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেছে সে। এবং তার পর পরই এগিয়ে এসেছে ওকে উদ্ধার করতে। খুটিয়ে খুটিয়ে শুনেছে তার সমস্ত কথা। কিছু টাকাও ধার দিয়েছে।

'ভাবতে পারো—স্রেফ একটা ওভারল পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো মেয়েটা। পায়ে মোজা ছিলোনা জুতো জোড়ার অবস্থাও বড়ো করুণ। লোকে ফ্যাপাতে শুরু করেছিলো ইতিমধ্যেই।'

'মেয়েটির বর্ণনাটা আর একবার দাও তো?'

'আমি তা পারবো না মোনা বললো

মোনা নিজের বন্ধু বলেই বারবার উল্লেখ করছিলো মেয়েটার নাম। আমার কাছে কেমন উদ্ভট বলেই মনে হলো ব্যাপারটা।

'মেয়েটার বয়েস কতো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'বয়েস? কি জানি—আমি ঠিক বলতে পারবো না। বাইশ তেইশ হবে বোধহয়। আসলে ওর বয়েস বোঝা যায় না ওকে তুমি যখন দেখবে, বয়েসের কথা তোমার মনেই আসবে না। আমার দেখা সবচেয়ে ব্যতিক্রমী প্রাণী। অবশ্য তোমাকে বাদ দিয়ে ভ্যাক

'মেয়েটি শিল্পী নাকি

'সে সবকিছুই। সবকিছু করতে পারে সে।'

'ছবি টবি আঁকতে পারে?'

'অবশ্যই। সে ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে, পুতুল বানায়, কবিতা

দেখে, নাচে—সব মিলিয়ে সে যেন একটা ভাঁড়। তবে তোমার মতোই এক বিষণ্ণ ভাঁড়।'

'মাথা খারাপ নয় তো?'

'নিশ্চয়ই নয়। তবে আমি আগেই বলেছি অন্য রকম। মুক্তমনা মেয়ে সে। অসম্ভব দুঃখীও। আর সমুদ্রের মতোই গভীর।'

'ক্লদের মতো, তাই না?'

মোনা হাসলো, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কি—তুমি হঠাৎ ক্লদের নাম করছো যে। দু'জনকে পাশা-পাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে পারো। দু'জনকেই অবশ্য ভিন্ন গ্রহের আগন্তুক বলে মনে হয়।'

'কাজেই তারা পরস্পরের পরিচিত।'

'আমি ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। বেশ মেলামেশা চলছে দু'জনের মধ্যে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ভাষায় কথা বলে। আর একটা ব্যাপার কি জানো? শারীরিক ভাবে তাদের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে।'

একটু খানি পুরুষালী ভাব আছে নাকি?'

'ঠিক তা নয়।' মোনা বললো। 'সে পুরুষদের পোষাক পরে এ জন্যেই যে, তাতে সে বেশি আরাম পায়। একথা ঠিক, বাস্তববুদ্ধি তেমন একটা নেই তার। আর সেই জন্যেই ওকে ভালোবাসি আমি।'

একথার মাধ্যমে তুমি আসলে কি বোঝাতে চাও?'

'ধরো, রাস্তায় একটা লোক এসে দাঁড়ালো ওর সামনে লোকটার গায়ে জামা নেই ও নিজের শার্টটা খুলে দেবে তাকে। নিজের অসুবিধার কথা একবারও ভাববে না সে। আর কেবল শার্টই নয়। দরকার হলে সে নিজের প্যান্ট পর্যন্ত খুলে দিতে পারে।'

'এর পরও তুমি ওকে পাগল বলবে না

'না ভ্যাল, আমি তা বলবো না। ওর জন্যে এগুলো খুবই স্বাভাবিক আচরন।'

'অদ্ভুত কোনো পরিবেশে ওর জন্ম হয়েছে খুব সম্ভব। ও কি ওর মাবাবার সম্পর্কে, ওর শৈশবের পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলেছে তোমাকে?'

'খুব সামান্য। মনে হয় অনাথ। যাদের কাছে ও লালিত, তারা নাকি খুব দয়ালু, অন্তত: মেয়েটির প্রতি। যা চেয়েছে, তাই-ই পেয়েছে সে।'

'ঠিক আছে, চলো শুতে যাই। কি বলো?'

চিরাচরিত নিয়মে এই সময় বাথরুমে গেলো সে। আমি বিছানায় শুয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর বাথরুমের দরজাটা দেখলাম খোলা

'যে কথা বলছিলাম,' ওর মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, 'ক্লদ ছেলেটা কীরকম আছে আজকাল? নতুন কোনো খবর আছে নাকি ওর?'

'দুয়েক দিনের মধ্যেই শহর ছাড়ছে ও!'

'যাচ্ছে কোথায় ?'

'সে কথা বলতে চায় না। আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, আফ্রিকায় যাবে।'

'আফ্রিকা ? আফ্রিকায় যাবে কি করতে ?'

'আমি তার কি জানি ? তবে হ্যাঁ, আমি এতে অবাক হইনি। সে যে কোনো সময় বলতে পারে আমি চাঁদে যাচ্ছি। ক্লদকে তুমি তো চেনোই।'

'বারবার কিন্তু এই একটি কথার ওপর জোর দিচ্ছো তুমি। কী ? না, ক্লদকে আমি চিনি। না, তুমি যতোটা মনে করো, ক্লদকে আমি ঠিক ততোটা চিনিনা। তাকে চেনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সে একটা হেঁয়ালি। হেঁয়ালি হয়েই থাকবে সে।'

'আমার বন্ধুর ব্যাপারেও আমি ঠিক এরকমই অনুভব করি।'

'তোমার বন্ধু,' আমি বাজিয়ে নিতে চাইলাম ওকে।

'ভালোভাবে পরিচয়ও তো হয়নি তোমাদের। এর মধ্যেই ওর সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন কতোকালের চেনা-জানা তোমাদের।'

'ছেলেমানুষী কোরোনা সে আমার বন্ধু, একমাত্র বন্ধু।'

'এমনভাবে কথা বলছো, যেন বুদ্ধিভ্রম ঘটে গেছে তোমার।'

'ঠিক বলেছো।' বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মোনা।

'কথাটার ব্যাখ্যা দিলে হয়না ?'

'আমি মরিয়া, আমি নিঃসঙ্গ, আমি দুঃখী। কাজেই একজন

বন্ধু আমার দরকার ছিলো। এমন কেউ, যাকে আমি বন্ধু বলে ডাকতে পারি।'

'তুমি যখনই একজন বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব করলে, তখনই মেয়েটির আবির্ভাব ঘটলো, তাই না? কিন্তু কেন, আমিই তো তোমার বন্ধু। আমি কি তোমার জন্যে যথেষ্ট নই?' কথাটা রসিকতা করে বললেও তাতে বাস্তবতাও খানিকটা আছে বৈকি।

আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে মোনা বললো, 'না, ভ্যাল, তুমি আর আমার বন্ধু নেই। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমাকে ভালোবাসি··· আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। কিন্তু

'কিন্তু কি?'

'আমার একজন বন্ধুর দরকার ছিলো। একজন, মেয়ে বন্ধু। এমন কেউ, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি এমন কেউ যে আমাকে বোঝে। অনুভব করে।'

'ও, এই কথা? তাহলে এটাই দেখা যাচ্ছে যে তুমি আমার সঙ্গে অকপটে কথা বলতে পারছো না?'

'পারছি বৈকি। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে খোলাখুলি ভাবে কথা-বার্তা বলা অন্য জিনিস। সে যাই হোক, ও এখন থেকে আমার বন্ধু। আমার কাছেই থাকবে।'

খানিকটা রসিকতা এবং খানিকটা বাস্তবতার সঙ্গে আমি বললাম, 'আমাকে তাহলে এখন তুমি হিংসুটে বানাতে যাচ্ছো?'

মোনা হাঁটু গেড়ে বিছানায় বসে আমার হাতের ওপর তার মাথাটা রাখলো। 'ভ্যাল।' সে ফিসফিস করে বললো, 'এটা যে সত্য নয়, তুমি তা জানো। তবে ওর সঙ্গে এই বন্ধুত্ব আমার কাছে খুবই মূল্যবান। এর ভাগ আমি কাউকে দিতে চাই না। এমনকি তোমাকেও নয়।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।' আমি খানিকটা জড়ানো গলায় বললাম।

'আমি জানতাম, তুমি বুঝবে।' মোনা তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলো। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে চুমো খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে আমার পাশে এসে শুয়ে পড়লো। জোড়া খাট আছে আমাদের। তবে আমরা দু'জন একটাতেই শুই।

'আমাকে শক্ত করে ধরো ভ্যাল।' মোনা অস্ফুট স্বরে বললো, 'আমি তোমাকে অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি ভালোবাসি। তুমি কি শুনতে পারছো আমার কথা?'

আমি কোনো কথা বললাম না। কেবল সজোরে জড়িয়ে ধরলাম মোনাকে।

'রুদ সেদিন কি বলেছে শুনবে?' মোনা আমার আদর উপভোগ করতে করতে বললো, 'তুমি আমার কথা শুনছো তো? রুদ বললো, তুমি নাকি পৃথিবীতে সেই সামান্য মানুষদের একজন, যে আমার সঙ্গে একীভূত হতে পারে।'

'নির্বাচিতদের একজন।' আমি রসিকতা করে বললাম।

'একজন নয় — একমাত্র পুরুষ।' বললো মোনা।

'কিন্তু বন্ধু নয়।...'

মোনা আমার ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখলো।

তারপর অন্য হাতে খুলে ফেললো আমার প্যান্টের জিপার। সোনার চাঁদ ইতিমধ্যে পরম হয়েই আছেন। র‍্যাদা করা গোল কাঠের টুকরোর মতো। শক্ত হয়ে উঠেছে শিশ্ন। ফুলছে সে আস্তে আস্তে। শির দাঁড়ার একদম নিচের দিকে থির থির করে কাঁপছে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। মোনা একহাতে আমার প্যান্ট ও অন্যহাতে নিজের নাইটি খুলে পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেললো। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে দুই আদিম নরনারীর মতোই এখন আমরা বাহুল্য বর্জিত। মোনার স্তন যুগোল পুরনো হবেনা কখনো। এখন সে আমার স্ত্রী। আমি তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি। করিও। সে-ও করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে তার বিবসনা দেহ প্রত্যেকবারই আমার কাছে নতুন মনে হয়। মোনা এক সময় ঘুরে গিয়ে আলতোভাবে চুমো খেলো আমার নুনুর মাথায়। তারপর বিড়ালীর মতো কামড়ে দিলো আস্তে করে। আমি ওকে ঘুরিয়ে এনে ঠিক আমার বুকের ওপর বসালাম। শিশ্নটা যেন আমার তলপেটের তলা থেকে রকেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে যাবে। মোনার নাভি জ্বল জ্বল করছে আমার চোখের সামনে। ঘাড়টা বাঁকা করে চোখ দুটো রাখলাম ওর যোনির দিকে। শ্বেত পাথরের ত্রিকোন সরোবরের মতো ঝলমলিয়ে উঠলো পৃথি-

বীর সবচেয়ে কাঙ্খিত কেন্দ্রটি। আমি বারবার বলি, জঘনে-স্ত্রিয়ের চারপাশে রোমরাজির অস্তিত্ব খুব স্বাভাবিক। মরুভূমিতে যেমন মরুদ্যান থাকে, এগুলোও ঠিক তেমনি। এর দরকার আছে। কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত এই সৌন্দর্যের এই স্বাভাবিক উপ-করণকে মোনা সহ্য করতে পারেনা। সে নিজে লোমনাশক সাবানের নিয়মিত ব্যবহারকারী। আমাকেও সে সময় হলেই নিজ হাতে পরিস্কার করে। পরিস্কার করে এজন্যে যে, আমি তাহলে ফাঁকি দেবো। আমিও মাঝেমধ্যে মোনাকে সাক-সুতরো করি। কিন্তু কাজেকর্মে পরিপাটি নই বলে নিজেও আবার হাতে লাগায় সেখানে। দামী ক্রীম এবং লোশন মাখে। আমাকেও মাখিয়ে দেয়। মোটকথা এব্যাপারে তার বিশুদ্ধবাদিতা প্রায় শুচিবাইয়ের মতোই মনে হয় আমার কাছে। মনে হচ্ছিলো, ওর যোনিটা অল্প অল্প কাঁপছে। যোনির মুখটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে পিচ্ছিল একটা ক্ষুদে মাংস পিণ্ড। সুঁচালো এবং কম্পমান। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতোই ফুটোর ভিতরটা লাল। যেন আগুন জ্বলছে সেখানে ধিকি ধিকি। আমি হ্যাচকা টানে ওকে আনলাম সামনের দিকে। ওর নিতম্বটা এখন আমার গলার ওপর। ও দু'দিকের পায়ের ওপর ভারসাম্য রেখে রুদ্ধশ্বাস হওয়া থেকে মুক্ত রাখলো আমাকে। আমি আর সহ্য করতে না পেরে ওর যোনির ফুটোয় ঢুকিয়ে দিলাম আমার তৃষ্ণার্ত জিহ্বাটাকে। যেন একটি সাপ ঢুকে পড়লো

নিজের গর্তে। আবেগে একটা শীৎকার ধ্বনি করে উঠলো মোনা। সেই সংগে আমার গলা থেকেও বেরুলো একটা বিচিত্র আওয়াজ। সংগমকালীন এই শব্দ যেন পশুদের শব্দের মতেই দুর্বোধ্য এবং সমশ্রেণীর। জিহবাটা ওর যোনির ভেতরে ক্রমাগত নড়ছিলো আর সেই সংগে থর থর করে কাঁপছিলাম আমরা উভয়েই। হঠাৎ একটা অস্ফুট চীৎকার দিয়ে মোনা ছিটকে পড়লো বিছানার ওপর। আমিও সংগে সংগে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ওর ওপর। স্তনের বোটায় কামড় দিয়ে তল-পেটে চাটতে চাটতে পিঠের নিচ দিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে দিলাম ক্ষিপ্র গতিতে। তারপর আমার ত্রিগুণ বর্ধিত শিস্নটি সরাসরি ঢুকিয়ে দিলাম ওর হাঁ হয়ে থাকা জনন-রন্ধ্রে।
এক মিনিট পর মনে হলো, আকাশ ভেংগে পড়ছে আমার মাথায় ওপর। সমুদ্র ফুসে উঠছে। প্রচণ্ড ঝড়ে আন্দোলিত হচ্ছে গাছপালা। একশোটা বাজ একসঙ্গে গর্জে উঠছে অকল্পনীয় আওয়াজে। মূর্ছিত হয়ে পড়লাম খুব সম্ভব আমরা দুজনই।

প্রতি রাত্রেই এক গল্প। মোনার কণ্ঠে একই গান—'আমার বন্ধু স্তাসিয়া।' তবে সব রাত্রেই সেই গল্পে নতুন নতুন মশলা থাকে। স্তাসিয়ার পেছনে লাগা নতুন নতুন উদ্ভট লোকদের বিশদ বর্ণনা মনোযোগের সঙ্গেই শুনতে হয় আমাকে। এক-

জনের নাকি অনেকগুলো বইয়ের দোকান আছে। কিন্তু নামটা জানা হয়নি। একজন আছে মুষ্টিযোদ্ধা। ড্রিসকল তার নাম। একজন আবার যৌনবিকারগ্রস্ত কোটিপতি—যার নামটা খুবই আদর্শ ধরনের, টিংকেল ফেলস। চতুর্থ জন এক উন্মাদ। যে আবার নিজেকে সন্ত বলে দাবী করে। তার নাম রিকার্ডো। তা এই শেষের লোকটার বর্ণনা শুনে তাকে আমার ভালো লাগে। রিকার্ডো একজন চমৎকার মানুষ। স্প্যানিশ উচ্চারণে সে কথা বলে। স্ত্রী এবং তিনটি সন্তানকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। খুবই গরিব কিন্তু আত্মাটা বড়ো। প্রচুর উপহার দেয় সে স্তাসিয়াকে। দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছে সে অনেকগুলো; কিন্তু ছাপা হয়নি এখনো। তবে দশ বারোজন শ্রোতা পেলেই সে বক্তৃতা দেয়। বিদায় নেবার সময় সে প্রতিদিনই স্তাসিয়ার হাত ধরে বলে শুভরাত্রি তারপর বিড়বিড় করতে থাকে--- 'আমি যদি তোমাকে না পাই, তাহলে কেউ তোমাকে পাবে না। তোমাকে আমি খুন করবো।'

রিকার্ডোর ব্যাবহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোনা কেমন তন্ময় হয়ে পড়ে। কিন্তু স্তাসিয়া? রিকার্ডোর প্রতি স্তাসিয়ার ব্যবহার মোটেই প্রশংসনীয় নয়। রিকার্ডোর কথাগুলোকে সে রসিকতা বলে মনে করে। 'আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম,' মোনা জানায়, 'কী করে তুমি বুঝতে পারলে যে রিকার্ডো একদিন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে?'

জবাবে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো কেবল স্তাসিয়া।
'ব্যাপারটা কি খুবই অসম্ভব বলে মনে হয় তোমার কাছে?'
'তুমি তাকে চেনোনা। সে এ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী ভদ্র প্রাণী।'
'তাহলে হাসছো কেন?'
'সে একটা মাছিরও ক্ষতি করবে না কখনো।'
'কিন্তু আবেগে ভালোবাসার পাত্রীকে সে হত্যা পর্যন্ত করতে চায়।'
'সে কি ভাবে আমার প্রেমে পড়বে বলো তো? আমি তো তাকে কোনো রকম ভালোবাসিনি। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি—ব্যাস। তাতেই আমার প্রেমে পড়তে হবে ওকে!'
'বড়ো নিঃসঙ্গ ওই রিকার্ডো। দেহ না দিলে, মনটা দিলে ক্ষতি কি তোমার। ওতো তাইই চায়।'
মোনার কথা শেষ হলে আমি চুপ করে থাকি। রিকার্ডোর মুখটা ভাবতে চেষ্টা করি। লোকটার জন্যে বড্ড মায়া হয় আমার। 'খুবই সুন্দর মানুষ ওই রিকার্ডো।' আমি বলি, 'স্প্যানিয়ার্ড বুঝি মানুষটা?'
'না, কিউবান।'
'ঐ একই হলো। সে যদি তুর্কী হতো, তাও তাকে ভালো লাগতো আমার।'
মোনা আচমকা বলে উঠলো, 'ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। কি বলো?'

'কাজটা খুব ভালো হবে বলে মনে হয়না।' আমি বললাম, 'ওরকম মানুষকে বোকা আর নাই বানালে। সে ক্রমওয়েল নয়। অবশ্য ক্রমওয়েলকে তুমি বোকা মনে করলেও সে তা ছিলো না কিন্তু।'

'আমি কখনো বলিনি যে সে নির্বোধ।'

'কিন্তু তুমি আমাকে সে রকম ভাবাতে চেষ্টা করেছো।'

'কেন করেছি—তা তো তুমি জানো।' মোনা মৃদু হাসলো। 'ছাখো বোন, তোমার সম্পর্কে আমি এতো বেশি জানি এবং বুঝি যে তুমি নিজেও তা জানো না।'

'তুমি কল্পনাপ্রবন মানুষ ভ্যাল। সেই জন্যেই তো অল্প কথা বলি তোমাকে। তুমি তারপর পুরো বিষয়টি গড়ে তোলো।'

'কিন্তু আমার নির্মানকাণ্ডের ভিত্তিটা যে শক্ত তাতো তুমি ভালোভাবে জানো।'

আবার সেই স্বভাব সুলভ হাসি মোনার।

তারপর কীভেবে হাসতে হাসতেই মুখ গুঁজলো সে বালিশে। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, 'আমার মনে হয় মেয়েরা মিথ্যে বলতে ভালোবাসে। এটা তাদের স্বভাব। মিথ্যে বলে পুরুষরাও। তবে তার ধরনটা অন্যরকম। মেয়েরা সত্যকে ভয় পায় ঠিক যমের মতো। তুমিও যদি আমার কাছে মিথ্যে বলা, বা ওই নির্বোধ খেলা থেকে বিরত থাকতে, তাহলে আমি…'

লক্ষ্য করলাম মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মোনার। ঠিক যেন

একটা জন্তু।

'মনে হয়, তুমি আমার কাছে যা চাইবে, তাই পাবে। এমনকি তুমি যদি ইচ্ছে করো, অন্য মানুষের হাতে তোমাকে তুলে দিতেও আমি প্রস্তুত।' আমি বললাম।

এই অভাবিত মন্তব্যে যেন হাঁফ ছেড়ে উত্তেজনামুক্ত হলো মোনা। তারপর আমার কাঁধের ওপর থুতনি রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। আমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলো সে।

'ভ্যাল,' সে বললো, 'তুমি তো জানো, আমি এমন কাজ কখনো করবো না। তুমি কেমন করে একথাটা বলতে পারলে? আমি মাঝে মধ্যে দু'একটা গুল মারি তোমাকে, এটা ঠিক। তাই বলে মিথ্যে কথা বলবো? তোমার কাছে গুরুতর কোনো বিষয়ই তো আমি গোপন রাখিনা। রাখতে পারবোও না আমি। তোমাকে আঘাত দিতে চাইনা বলেই ছোট-খাটো গুলতাপ্পি মারি সময় সময়। আমি সত্যিকার পৃথিবী-টাকে চিনি। কিন্তু তুমি চেনোনা। তুমি স্বাপ্নিক। তোমার দেখার চোখ আলাদা। তাছাড়া তোমার আদর্শ রয়েছে। মানুষ কতো বেশি দুর্নীতিপরায়ন ও পাপিষ্ঠ, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারনাই নেই, ভ্যাল। সব মানুষের কেবল ভালো দিকটাই নজরে পরে তোমার। তুমি নিজে সৎ। কাজেই অন্যদেরকেও সৎ মনে করো। ক্লদও অনেকটা তোমার মতোই। সেও কোনোদিন কোনো খারাপ কাজ করতে

পারেনা। তোমার সম্পর্কে তার অত্যন্ত উঁচু ধারনা। আমি বাইরে এক রকম, ভেতরে আর এক রকম। তোমার কাছে ফিরে আসি কেবল তোমার হয়েই। তুমি আমকে যেরকম দেখতে চাও আমি সেই রকমই হতে চাই। কিন্তু তোমার মতো কি হতে পারবো কখনো। মনে হয়না।'

'ভাবছি, তোমার এসব কথা শুনে ক্রনস্কি, ও'মারা, উলরিক এরা কি ভাবতো তোমার সম্পর্কে।'

'অন্যরা কি ভাবলো, তাতে কি আসে যায়? ভ্যাল, আমি তোমাকে চিনি। তোমার যে কোনো বন্ধুর চেয়েই বেশি চিনি তোমাকে। তারা তোমার যতো পুরনো বন্ধুই হোক না কেন? আমি জানি, তুমি কীরকম স্পর্শকাতর। জীবন্ত প্রাণী-দের মধ্যে তুমি হচ্ছো সবচেয়ে কোমলমনা।'

'খুব ভালো লাগছে তোমার কথাগুলো। হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে।'

'তুমি ঠিক হালকা বা পলকা নও। তুমি দৃঢ়, শক্ত। অন্য সব শিল্পীর মতোই। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর কাছে তুমি নেহাত শিশু। এখানে তোমাকে আগন্তুক বলেই মনে হয়।'

'যেন একটা বইয়ের মতোই পড়ে ফেলেছো আমাকে?'

'আমি যা বলছি, সত্য বলছি। অস্বীকার করতে চাও আমার কথা?' কথা শেষ হলে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ ঘষতে লাগলো সে।

'ভ্যাল, তোমার যোগ্য নারী আমি নই। কিন্তু আমি তোমাকে

জানি। আর যতই তোমাকে জানতে পারছি, ততোই বেশি ভালোবাসছি আমি। তোমাকে ছাড়া আমার একদণ্ডও ভালো লাগে না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যে দুই নষ্ট শিশুর মতোই আচরণ শুরু করেছি। তুমি কি তা বুঝতে পারছো? আমরা চাই থালা ভরা খাবার আমাদের সামনে এসে হাজির হোক।'

'আমি তা মনে করিনা।' মোনা আপত্তি করে, 'আমি তোমাকে এমন সহায়তা দিতে চাই, যাতে তুমি নির্বিবাদে করে যেতে পারো তোমার সাধনা। তুমি তো ধ্বংস হয়ে যেতে পারোনা। আর প্রত্যাশাও তো খুব বেশি নয় তোমার। যেটুকু না হলেই চলেনা, সেটুকুই তুমি চাও।'

'তা সত্যি।' আমি সবিস্ময়ে বলি। কেননা আমার প্রকৃত রূপটা একমাত্র মোনার চোখেই ধরা পড়েছে। আর কেউ ধরতে পারেনি আমার এই চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারটা। 'তুমি আমাকে সহায়তা করছো ঠিকই।' আমি বললাম, 'কিন্তু এ মুহূর্তে খানিকটা বেশি করছো আনাস্তাসিয়ার জন্যে। আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না। আমি জানি, আমি কী বলছি।'

'ওর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। ভ্যাল, হতভাগী তো জানেইনা, কীভাবে টাকা রোজগার করতে হয়। সে শিশুর চেয়ে নির্বোধ। তোমার চেয়েও।'

'তোমার পাল্লায় পড়ে ওর শিশুত্ব আরো পাকা পোক্ত হচ্ছে।

আমি তাকে জোঁক বলছি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সে কাজ করেনা কেন? সে পুতুল বেচতে পারে, ছবি অথবা মূর্তি বেচতে পারে। কেন তা করছে না?'

'কেন পারছে না?' মোনা হেসে বললো, 'যেজন্যে তুমি পারছোনা তোমার লেখাগুলো বিক্রী করতে। খুবই উঁচু মানের শিল্পী সে। কিন্তু কে তাকে পাত্তা দিচ্ছে বলো?'

'তার তো আর্ট ডিলারের কাছে যাবার দরকার নেই। সে নানা জনের কাছে নিজের শিল্পকর্ম বেচতে পারে।'

'আবার পেছনে ফিরে যাচ্ছো তুমি। আমি তো বহুবার বলেছি যে, দুনিয়ার হালহকিকৎ সে কিছুই বোঝেনা। অনেকটা ওই রিকার্ডো এবং তোমার মতোই। তোমরা আত্মরক্ষা করতে জানোনা। তোমাদের রক্ষা করতে হয়।'

'কিন্তু আমি এখনো লেখক হয়ে উঠিনি। ভালো লেখা আর লেখক হয়ে ওঠা, আলাদা 'জনিস।' আমাকে আরো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। আমি যখন নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করবো, লোকে আমার লেখা পড়বেই। পৃথিবী কতোটা নষ্ট, সে ব্যাপারে থোড়াই পরোয়া করি আমি। আমার লেখা সবাইকে পড়তেই হবে। তুমি দেখে নিও। আমাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তাদের হবে না।'

'তার আগে পর্যন্ত কী করবে?'

'বেঁচে থাকার জন্য অন্য কিছু একটা করবো।'

'বিশ্ব কোষ বিক্রী, তাই না? কিন্তু এটা একটা বেঁচে থাকা

হলো ?'

'তা তো নিশ্চয় নয়। কিন্তু ভিক্ষে করার চেয়ে ভালো। ভালো, ধার করার চেয়ে। ভালো, স্ত্রীকে বারবনিতা হিসেবে ব্যবহার করার চেয়েও।'

'আমি খেটে খাই। প্রতিটি পেনীই আমার নিজের উপার্জিত।'

'অস্বীকার করিনা। কিন্তু তুমি যেমন আমার বই ফেরি করা দেখতে পারোনা, আমিও তেমনি তোমার রেস্তোর'ার টেবিলে কাজ করা সইতে পারি না।'

বলতে গেলে, রমন-ক্লান্ত হলেও সারারাত নানা রকমের কথাবার্তায় ডুবে থাকলাম মোনা আর আমি। আমাদের চোখে একটুও ঘুম এলোনা। যখন সূর্য উঠছে তক্ষুণি আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙ্গলো অনেক দেরীতে আমার মাথার মধ্যে তখন আনাস্তাসিয়ার চিন্তা। ওকে মনে মনে হিংসা করি আমি। মোনার সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় আর ক'দিনেরই বা। কিন্তু এর মধ্যেই স্তাসিয়ার দেয়া জিনিসপত্রে ঘরটা ওর ভরে গেছে। এগুলো এক্ষুণি সরানো দরকার। বিছানার ওপর দিককার দেয়ালে দুটি জাপানী প্রিন্ট ঝুলছে। একটি উতামারোর অন্যটি হিরোশিগের। তোরঙ্গের ওপর একটা পুতুল, যেটা মেলার জন্যেই বিশেষভাবে তৈরী করেছে স্তাসিয়া। শিফনিয়ারের ওপর দেখা যাচ্ছে একটা রুশ-আইকন। এটাও আনাস্তাসিয়ারই দেয়া। আরো চোখে পড়ছে বুনো চেহারার বালা,

চিত্রিত জুতো এবং এই ধরনের অনেক জিনিস। খুব সুন্দর একটা সুগন্ধীর বোতল দেখা যাচ্ছে, যা মোনার টাকাতেই মোনাকে কিনে দিয়েছে হয়তো আনাস্তাসিয়া। মোনা নতুন নতুন পোশাক পরতে ভালোবাসে। কিন্তু তার 'বন্ধু' ভালোবাসে সিগারেট কিংবা রঙ-তুলি। কিন্তু মোনা তাতে বিস্মিত নয়। সে বন্ধু প্রেমে এতোটাই অন্ধ যে তার হাতব্যাগ থেকে যখন তখন টাকা পয়সা চুরি হয়ে গেলেও আনাস্তাসিয়ার কোনো দোষ ধরা পড়েনা তার চোখে। চারদিকে ছত্রাকারে পড়ে আছে বেশ কিছু বই। সব ক'টাই পড়তে দিয়েছে আনাস্তাসিয়া। একটা বইয়ের নাম 'ডাউন দেয়ার'। এক 'অধঃপাতত' ফরাসী লেখকের লেখা। আনাস্তাসিয়ার প্রিয় বইয়ের একটি এ বই। অধঃপতিত লেখকের লেখা বলে নয়। বইটি জোয়ান অব আর্কের অন্যতম অনুসারী গিলে দ্য রোয়ার জীবনের ওপর লেখা বলে। অসংখ্য শিশুকে সে হত্যা করেছিলো। ধ্বংস করেছিলো গ্রামের পর গ্রাম। ফরাসী ইতিহাসের এক অন্যতম বর্ণাঢ্য চরিত্র। মোনা সময় পেলে পড়তে অনুরোধ করেছে আমাকে বইটা। আনাস্তাসিয়া নাকি মূল ফরাসী বইটাই পড়ে ফেলেছে আগেই। সে কেবল ফরাসী আর ইতালীয় ভাষাই জানেনা! বরং জার্মান, পর্তুগিজ এবং রুশ ভাষাও জানে। কনভেন্ট স্কুলে সে শিখেছে চমৎকার পিয়ানো এবং হার্প বাজাতেও।

'সে ট্রাম্পেট বাজাতে জানেনা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

মোনা হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'ঢোল পর্যন্ত সে বাজাতে পারে। কিন্তু তার আগে তাকে খানিকটা নেশা করে নিতে হয়।'

'নেশা মানে? মদ টদের নেশা?'

'না। মারিজুয়ানা। ওতে কোনো দোষ নেই কেউ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না। মদের মতো মারাত্মক তো নয়ই। খুব নাকি উদ্দীপনা হয় দেহে মনে। আমি একদিন টেনে দেখবো। জানো, এ তল্লাটের সব মান্যগণ্য মানুষরা মারিজুয়ানার ভক্ত? মদ তো নয়, এগুলো হচ্ছে মাদকদ্রব্য। লোকে ড্রাগ শব্দটা শুনলেই অমন আঁৎকে ওঠে কেন বুঝিনা। মেক্সিকান ড্রাগের কথাই ধরো। এটা থেকে রঙ সম্পর্কে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা আসে মনে। তুমিও একদিন নিয়ে দেখতে পারো। কী নাম যেন ওই কবিটার? স্তাসিয়া ওর কাছ থেকে মাঝে মধ্যেই জিনিসটা আনে। আবার আনলে তোমাকে দেখাবো। কবিটাকে আমার পছন্দ হয় না। বাজে লোক। অবশ্য আনাস্তাসিয়া খুব ভক্ত ওই লোকটার তার মতে ও একটা মস্তবড়ো কবি। আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম। আমার মনে হয় আনাস্তাসিয়াই ওই ছোকরাটার চেয়ে হাজার গুণ ভালো লেখে? আমি ওর একটা কবিতা এনে পড়ে শোনাবো তোমাকে। স্বীকার করতে বাধ্য হবে তুমি যে, কখনো আর এরকমটি তুমি শোনোনি।' একনাগাড়ে মস্ত একটা বক্তৃতা দিয়ে যেন দম

নেবার জন্যই থামলো মোনা।

আমি স্তম্ভিত হয়েই শুনছিলাম। চমক ভাঙ্গতেই বলে উঠলাম, 'আমি জানি সে একটা প্রতিভা। একটা জিনিয়াস ওই মেয়েটা।'

'অবশ্যই জিনিয়াস।' মোনা দৃঢ়তার সঙ্গে বললো। 'সে একটু ক্ষ্যাপাটে হতে পারে—একথা মানি। কিন্তু তা ওই স্টিণ্ডবার্ক, দস্তয়েফস্কী অথবা ব্লেকের মতোই।...'

'কি যে বলো। কার সঙ্গে কিসের তুলনা।'

'তুলনা করছি না। ওর প্রতিভার কথা বলছি।'

'কিন্তু বড্ড বেশি পর নির্ভর। নয় কি?'

'তোমার মুখে এটা শোভা পায় কতোটুকু?'

'অনেক খানিই পায়।' আমি জোর গলায় বলি, 'তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগেও কি আমি স্ত্রী আর সন্তানের ভরণ পোষণ করিনি?'

'করেছো, কিন্তু চিরদিনের জন্যে নয় নিশ্চয়ই'।

'অবশ্যই নয়। কিন্তু পরিণতিতে আমি একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি।'

'পরিণতিতে? ভ্যাল, তুমি বেশি সময় পাওনি। ত্রিশই পার হওনি এখনো। নিজের নামটাকে উজ্জ্বল করে তোলার দরকার আছে তোমার। আনাস্তাসিয়া তো একটি মেয়ে মাত্র।কিন্তু দেখেছো— এর মধ্যেই সে কতোখানি সম্পূর্ণ?'

'আমি জানি। কিন্তু তখন সে একটা জিনিয়াস।'

'ওহ, থামো। এভাবে কথাবার্তা বলে আমরা কোথাও পৌঁছুবো না। ওর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পরিহার করছো না কেন। সে তোমার জীবনযাত্রায় কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তুমি কেন ওকে ঘাটাতে যাবে? আমার কি একজন বন্ধু থাকতে পারেনা? কেন ওকে হিংসে করবে তুমি যা করা উচিত, তাই তো তুমি করবে। কী, করবে না?'

'ঠিক আছে। প্রসঙ্গটা থাক এখন। কিন্তু ওর সম্পর্কে কথা বলা থামাবে কি তুমি? তাহলে আমিও এমন কিছু আর বলবো না---যাতে তুমি আঘাত পাও।'

মোনা যদিও আয়রণ ক্যালড্রনে না যাবার ব্যাপারে আমাকে খোলাখুলি কিছু বলেনি, আমি তার ইচ্ছের প্রতি সহানুভূতি বশতই ওদিকে পা বাড়াই না। আমার মনে হয়, আনাস্তাসিয়া রোজই তার বেশির ভাগ সময়ই কাটায় ওখানে। মোনা যখন সময় না একটু বিরতি পায়, তখন ওরা দুজনে কোথাও নিভৃতে চলে যায়। পথে বেরিয়ে প্রায়ই আমার কনে আসে, ওরা মিউজিয়ামে অথবা আর্ট গ্যালারিতে গেছে। অথবা গেছে কোনো শিল্পীর স্টুডিওতে। কোনোদিন নদী তীরে যাবার খবরও শুনি। সেখানে বসে আনাস্তাসিয়া নৌকা অথবা আকাশ-আঁচড়া দালানগুলোর স্কেচ করে। কখনো কখনো মোনা আর ওই মেয়েটি যায় লাইব্রেরীতে রিসার্চের

কাজে। একদিক দিয়ে এই পরিবর্তন মোনার জন্যে ভালো। এ তাকে নতুন চিন্তার অবকাশ এনে দিয়েছে। ছবিটবি সম্পর্কে তার জ্ঞান খুব কম। কিন্তু আনাস্তাসিয়ার সাহচর্যে সে সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।

আমি আছি আমার কাজ নিয়েই আপাতত। কখনো কখনো বিনা চেষ্টায় বিক্রী করছি বিশ্বকোষের এক আধটা সেট। এ ব্যাপারে দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা কাজ করছি আমি। এক একটা ঠিকানা যোগাড় করে সাধারণতঃ শহর থেকে দূরে চলে যাই আমি। ট্রেনেই যাই বেশির ভাগ সময় কখনো নিউ জার্সি। কখনো নিউ ইংল্যাণ্ড। স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডেও চলে যাই এক ধরনের নস্ট্যালজিক-টানে। গাড়ির ভাড়া না থাকলে হিচ-হাইকিং করি। নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে দয়ালু চেহারার মানুষের দিকে এগিয়ে যাই। বাড়ি ফিরতে আমার যতো দেরীই হোকনা কেন, মোনা সব সময়ই ফেরে আমার পরে। নিজেকে পরিস্থিতির হাতে ছেড়ে দিতে সে কি আনন্দ। আমি জাহাজেও গিয়ে উঠি লুজলীফ এনসাই-ক্লোপিডিয়া বিক্রী করার জন্যে। যখন তখন চলে যাই হয়তো বা কোনো বিচিত্র শহরে। ঢুঁ মারি সমস্ত ধরনের দোকানে। কখনো নলমিস্ত্রী কখনো বা বন্ধকী কারবারের দোকানেও ঢুকে পড়ি দুমদাম করে। এদের স্বাতন্ত্র আমার চোখে খুব একটা ধরা পড়ে না। যাই হোক, দোকানে ঢুকেই শুরু করে দিই কথা-বার্তা। সেসময় বেচাকেনার চিন্তাই আমার মাথায়

থাকেনা। আমি বরং লক্ষ্য করতে থাকি আমার বক্তব্যের পর শ্রোতার অস্বাভাবিক অজ্ঞতার ছাপ মারা মুখটাকে। আমার একটি কথাও হয়তো সে বুঝতে পারছে না। যেন তাদের কাছে আমি ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে গিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের বিশ্বকোষ প্রসঙ্গ যদি কোনো অসহায় লোককে আরো বেশী অসহায় করে তোলে, তখন তাদের ভাষাতেই কথা বলতে শুরু করি আমি। আর এমনি ভাবে হাতড়াতে হাতড়াতেই আমি পেয়ে যাই কোনো সহৃদয় ক্রেতা।

একদিন স্তাসিয়াকে অন্য রুমে সরে যেতে বলা হলো। কেননা সে ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড আওয়াজে কথা বলে। আর একদিন তার রুমে তাকে পরিদর্শন করতে এলো একটা ভূত। ভূতে জোর করে তাকে বাইরে নিয়ে গেলো রাতের অন্ধকারে। অন্য এক উপলক্ষে তাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলো একটা মাতাল। সে অবশেষে দিনের বেলা ঘুম সেরে রাত্রে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো রাস্তায় রাস্তায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এমন সব কাফেতে বসা আরম্ভ করলো, যেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সেখানে মার্বেল টপ টেবিলের ওপর কাগজ রেখে সে কবিতা লেখে। এক হাতে হয়তো একটা আধ খাওয়া স্যাণ্ডউইচ। পাশে খাবারের প্লেট, যাতে সে হাত দেবারও সময় পায়নি। কখনো কথা বলে সে বিশুদ্ধ স্লাভ উচ্চারণে। কখনো তাকে

মনে হয় মনটানা থেকে আসা গেছো মেয়ে। প্রায়াশ সে টয়লেটে যাবার কথা ভুলে যায়। ওই ছোট খাটো কাজটি করে চেম্বার পটের মধ্যে, এবং তা পরিস্কার করার কথা একদম মনে থাকেনা তার। এসব ঘটনা মোনার চোখেও ধরা পড়ছে ইদানীং। এতে মোনার কাছে তার ওজনও কমে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কি? মোনা তার সেবার হাত গুটিয়ে নেয়নি স্তাসিয়ার ওপর থেকে। ছায়ার মতোই লেগে থাকে তার সঙ্গে। এমনকি দরকার পড়লে মলত্যাগের পর মোনা ওর শৌচক্রিয়ার দায়িত্ব নিতেও পেছপা নয়। তবুও ওকে মনে করতে দেয়া যাবেনা যে ও নিঃসঙ্গ। যদি সপ্তাহে তিন অথবা চার রাত মোনা ওর সংগে থাকে, তাহলে মেয়েটিই কি সর্বেসর্বা নয়?

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। কারো না ভ্যাল?'

আমি নিরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাই। সে যখন আনা-স্তাসিয়ার সঙ্গে রাত কাটিয়ে এসে মায়ের অসুস্থতার ছুতো দেখায়, যখন বলে, তার সেবাশুশ্রূষাতেই সে ব্যস্ত ছিলো, আমি সবকিছু আঁচ করতে পারি।

ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললে কেমন হয়? যে কথা সেই কাজ। আমি রিসিভার তুলে নিই। কথা বলি ওর মায়ের সংগে অন্য বিষয়ে। চেষ্টা করি, ওর মায়ের কথায় এমন কিছু মনে হয় কিনা, যাতে টের পাওয়া যায় যে মোনা তার আশে-পাশে আছে। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে ওর মাকে জিজ্ঞেস করি, মোনা ওখানে আছে কিনা। থাকলে, কথা

বলতাম ছুটো। বলাই বাহুল্য, মোনা কখনো ওখানে থাকেনা। অবশ্যই নয়।

'দু'একদিনের ভেতর ওর সংগে আপনার দেখা হয়েছে কি?'

না-বাচক জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিব্রত মনে হয় বেচারাকে। মোনাকে একদিন বললাম: ওর স্বামীর কাছে একটা খবর পাঠাচ্ছো না কেন?'

'ওর স্বামী?'

অনেকক্ষন আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। তারপর হঠাৎ করেই মোনার প্রশ্ন, 'ওর তাহলে বিয়ে হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। আমি ওর স্বামীকে খুব ভালোভাবে চিনি।'

'আমার পেছনে লেগেছো শুনলাম। কেন লেগেছো?'

'তোমার মায়ের সংগে কাল কথাবার্তা হলো।'

কোনো কথা বললো না মোনা।

'হ্যাঁ, আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম সেদিন।' আমি আবার বললাম। এবারও কোনো কথা নেই মোনার মুখে।

'মজার ব্যাপার কি জানো?' আমি বললাম। 'উনি বললেন, বহু দিন ধরে তাঁর সংগে তোমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। তিনি নাকি ভেবেছিলেন, তুমি মারা গেছো।'

কতক্ষন এভাবে চুপ করে থাকবে মোনা? আমি ভাবতে থাকি সবিস্ময়ে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে মোনা। হাসতে হাসতেই বলে, 'আমার মায়ের সংগে কথা বলেছো, তাই না? হা হা

হাঃ। শুনে যা খুশি হলাম আমি। হিঃ হিঃ হিঃ। বেচারা ভ্যাল, আমার মা মারা গেছে। আমার মা নেই হোঃ হোঃ হোঃ।'

'থামবে এবার।' আমি নরম গলায় বলি।

কিন্তু মোনার হাসি আর থামেনা। থামবে কি করে। এমন কৌতুককর, এমন উদ্ভট কথা এর আগে সে কখনো শুনলে তো?

'শোনো, তুমি সেদিন রাত্রে বলোনি— তোমার মায়ের অসুখ? আর তাঁর সেবার জন্যেই সেখানে রাত কাটাতে হয় তোমাকে?'

আবার হাসির দমক।

'ও, তাহলে উনি বুঝি তোমার সৎ মা!'

'তুমি চাচীর কথা বলছো বোধহয়!'

'তা হবে। তাহলে তোমার মা কে?'

আবার হাসির আওয়াজ উঠলো চারদিক কাঁপিয়ে।

'তুমি যার সঙ্গে কথা বলেছো, তিনি বোধহয় চাচীও নয়। কেননা, চাচী তোমাকে চেনে। খুব সম্ভব পাশের বাড়ির কেউ টেলিফোন ধরেছিলো। কিংবা আমার বোনও হতে পারে। তার আবার এই ধরনের কথা বলবার অভ্যেস আছে কিনা!'

'কিন্তু তারা আমাকে ভুল তথ্য দেবে কেন?'

'যেহেতু তোমাকে উটকো লোক মনে করেছে ওরা। তুমি যে আমার স্বামী, এ কথাটা খুলে বলতে কে তোমাকে মানা

করেছিলো ?'

'গলার আওয়াজ কিন্তু তোমার চাচী কিংবা বোনের মতো মনে হয়নি আমার কাছে।'

'তুমি কি করে তা বুঝলে ? তুমি তো তাদের চেনো না ?'

'রাখো এসব কথা। ভাবছি, আমি তাদের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলে আসি একদিন।'

হঠাৎ মোনাকে সিরিয়াস মনে হলো। খুবই সিরিয়াস।

'হ্যাঁ'— আমি বলেই চললাম, 'আমার মাঝে মধ্যেই ইচ্ছে হয়, একদিন ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে পরিচিত হই।'

মোনা এবার ভীষণ রেগে গেলো।

'ভ্যাল, যদি তুমি সত্যি এমন কিছু করো— তাহলে তোমার সঙ্গে কখখনো আর কথা বলবো না। সেই মুহূর্তে চলে যাবো এখান থেকে।'

'তার মানে, তুমি চাওনা— তোমার পরিবারের কারো সঙ্গেই আমার পরিচয় হোক ?'

'ঠিক তাই। কখখনো এটা চাই না আমি।'

'কিন্তু এটা অকারণ ছেলে মানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি তুমি তোমার পরিবার সম্পর্কে আমার কাছে কিছু মিথ্যে কথাও বলেছো।'

'আমি কোনোদিন তা বলিনি।' মোনা ভেঙ্গে পড়লো একেবারে।

'বাজে কথা বোলোনা। ওই একটি মাত্র কারণে তাদের সঙ্গে

আমাকে আলাপ পরিচয় করতে দাওনি তুমি। অথবা কে জানে, তুমি হয়তো মনে করেছো, তাহলে আমি তোমার সত্যিকার মাকে খুঁজে পেয়ে যাবো।'

মোনা প্রচণ্ড রেগে গেছে। কিন্তু 'তোমার মা' শব্দবন্ধটি তাকে হাসিয়ে তুললো আবার।

'তাহলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না? তাই না! বেশ, ঠিক আছে। একদিন তোমাকে আমি নিয়ে যাবো সেখানে। আমি হলফ করে বলছি।'

'তাতে আর কতোটাই লাভ হবে। আমি তো তোমাকে ভালো ভাবেই চিনি। ওভাবে গেলে একটা মঞ্চ তৈরী হয়ে থাকবে আমার জন্যে। না স্যার— যদি যেতেই হয়, একা যাবো।'

'ভ্যাল, আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি কিন্তু তোমাকে। যদি তুমি তাই করো…'

'আমি যদি তা করি, তুমি জানতেও পারবে না।'

'অসম্ভব। অবস্থা এতোটা খারাপ হয়েছে বলে মনে করিনা আমি। তুমি যখনি যাই করো— আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে। এ আমার বিশ্বাস।'

মোনাকে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। ঠোঁটের ফাঁকে সে গুঁজে দিয়েছে একটা সিগারেট। আমার মনে হলো, আস্তে আস্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে সে।

'এদিকে তাকাও।' সবশেষে আমি বললাম, 'এসব কথা ভুলে

যাও। আমি…'

'ভ্যাল, আমার গা ছুঁয়ে বলো, অমন কাজটি তুমি করবে না।'

আমি ক্ষণিকের জন্যে চুপ করে রইলাম।

সে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। সকাতর মিনতি ভরা দৃষ্টি নিয়ে সে তাকালো আমার মুখের দিকে।

'ঠিক আছে। আমি হলফ করলাম।' উচ্চারণ করলাম এই কথাকটি আমি খুব ধীরে ধীরে।

কথা রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার ছিলো না আসলে। উপরন্তু রহস্যের শেষ ধাপটি পর্যন্ত নেমে দেখার ব্যাপারে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম। তবে, তার জন্যে এতো তাড়াহুড়োর দরকার কি? সময় যখন হবে, ঠিক তখনি আমি মুখোমুখি হবো ওর মায়ের। এবং সেই মা-টি হবেন অবশ্যই তার প্রকৃত মা।

৭

চূড়ান্ত পর্যায়ে আমি এখন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি প্যেটে এবং নিটশেকে। বলতে গেলে এঁদের দু'জনের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আমার যা কিছু অর্জন, তার সবটাই আমি

পেয়েছি এই দুই দিকপালের কাছে।

গ্যেটে আমাকে দিয়েছেন পদ্ধতি। আর নিটশে দিয়েছেন জিজ্ঞাসু মনোভঙ্গী। শেষোক্ত জনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের নিয়ামক নির্ধারণ করতে বললে, আমি জবাব দেবো এই যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি পর্যবসিত করেছি দৃষ্টি এড়ানোর। কিন্তু লেবানৎজের চ্যালা হিসেবে নিজের চিন্তাধারায় এই ব্যাপারটাকে তিনি না জেনে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়, তারই ভাবধারা আমার মধ্য দিয়ে একটা আকৃতি লাভ করেছে আস্তে আস্তে। এত বছর যাবৎ এমন মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যেও আমি এই জার্মান দার্শনিকতাতে বিস্মৃত হইনি। বরং মনেপ্রাণে তা আঁকড়ে ধরেছি।

'দ্য ডিক্লাইন অব দ্য ওয়েস্ট'-এর এই কথাগুলো আমাকে বেশ তাড়া করে ফিরেছে সব সময়। আমার অতি সাম্প্রতিক নিঃসঙ্গতাই অবশ্য সুযোগ এনে দেয় এই বইটা পড়ার। কাজ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করি। তারপর চোখের সামনে মেলে ধরি এই আশ্চর্য বই। মানুষের নিয়তি, তার অনিবার্য অভিযাত্রার একটার পর একটা দৃশ্যপট উন্মোচিত হতে থাকে আমার সামনে। এ বই আমার কাছে দর্শন বা ইতিহাস নয়। এমনকি নয় অংগ সংস্থান বিদ্যার মানদণ্ডটিও। বরং বিশ্বকাব্যই একে বলতে পারি আমি। ধীরে অতি ধীরে আমি এর স্বাদ নিই। বলা যায়, একটু একটু করে চাখি। কখনো কখনো চিবোই আমি। ঢুকে পড়ি প্রসঙ্গের গভীর থেকে

গভীরতরে। আমি তলিয়ে যাই পুরোপুরি।

কখনো বিছানার ওপর বসে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকি আমি। যেন দেয়াল ভেদ করে আমার দৃষ্টি চলে গেছে সুদূর অতীতের দিকে। যে অতীত আমার কাছে অতলস্পর্শী অথচ জীবন্ত। মাঝে মধ্যে আমার সামনে এমন এক একটি বাক্য কিংবা অলঙ্কার জেগে ওঠে যা আমাকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয় বাইরের রাস্তায়। যেখানে আমি বিচরণ করতে থাকি স্বপ্নচারীর মতো।

বরো-হলের জো-এর রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে থাকি যখন তখন। মস্ত আকারে অর্ডার দিয়ে বসি হঠাৎ। প্রতিবার খাদ্যবস্তু চিবোবার সময় যেন অতীতকেই চর্বন করি আমি। ছেলে-বেলায় আমি পাঠবিমুখ এক ক্রুফলীন বালক। স্কুলের বই পড়তে সে কি ঘেন্না হতো আমার। কল্পনা করা যায়না। প্রচলিত চিন্তা ভাবনার ধারাকে যারা চিরকাল অগ্রাহ্য করেছে, আমি ছিলাম তাদেরই একজন। সমুদ্রে ভাসমান কর্কের মতো আমি অনুসরণ করেছি অংগ সংস্থানকারী এক বিশাল দৈত্যকে। সে আমার চোখে এমন মায়ার সৃজন করতো যেন আজীবন অনুসরণ করতে পারি তাকে। প্রাণ জাগতো, আমি কি সত্যিই কাউকে অনুসরণ করছি? নাকি ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছি কোনো ঘূর্ণিপাকে। কী সে জিনিস—যা আমাকে এমন সুবোধ্যতা আর আনন্দের অনুভূতি জাগিয়েছে পঠন-কালে? ওই দানবটির চিন্তা আমার কানে যেন সঙ্গীত-সুধা

বর্ষণ করতো। বহু গোপন সুর ভেসে আসতো আমার কানে। যদিও আমি পড়ছি ইংরেজিতে লেখা বই ; কিন্তু পড়তে পড়তে মনে হয়, মূল গ্রন্থই পাঠ করছি। তাঁর বাহন জার্মান ভাষা। যা, আমার ধারণা, আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু আসলে দেখা যায়, আমি কিছুই ভুলিনি।

'ফ্রম নিটশে টু কোয়েশ্চনিং ফ্যাকালটি।' এই ছোট্ট ফ্রেজটি আমাকে যেন নাচিয়ে তোলে।.....

কোন দার্শনিক সম্পর্কে কোনো কিছু লিখতে যাওয়া কারো জন্যেই নয় অনুপ্রেরনা-সঞ্চারী। বিশেষ করে সেই দার্শনিক যদি হয় কবি। নিজেকে আমার আবারো মনে হয় অপরিপক্ক। যেন আমি কারো কাছে স্বাধীনতা চাইছি। ছেলেবেলায় জটিল ধরনের সব বই চাইলে লাইব্রেরীর লোকটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো।

'তুমি কেন এসব বই চাও ?'

'কেন চাইবো না।'

আমার মগজ কতোটুকু শক্ত—সে ব্যাপারে থোড়াই পরোয়া করি আমি। সবই তো বুঝতে পারছি। আমি আমার যা খুশি তাই পড়বো। যখন ইচ্ছে করবে, তখন। তা, পাঠের এই স্বাধীনতা আমি ভোগ করে আসছি গোড়া থেকেই। ভোগ করবোই না বা কেন ? জন্ম আমার আমেরিকায়। মুক্ত বিশ্বের নাগরিক আমি। বয়েসে কি আসে যায় ?

আজীবন প্রশ্নে বিদ্ধ আমি। আবাল্য। অতো জিজ্ঞাসু

মনোভাব কতোটা বাঞ্ছিত? শোনা যায়, পাগল হবার আগে মানুষ অত্যধিক প্রশ্ন প্রবণ হয়ে পড়ে। আবার মহাপুরুষরাও শৈশবে থাকেন প্রশ্ন-পরায়ণ। স্পেঙ্গলার পড়বার পর আমার মনে হয়েছে, শৈশবের চিন্তাভাবনা কতো সুন্দর ছিলো আমাদের। বয়েস ছিলো কম। অভিজ্ঞতা নেই বলাই ভালো। অথচ জীবনের মৌলিক দিকগুলো ওই বয়েসেই মোটা তুলির দাগের মতো আঁকা গিয়েছিলো মানসনেত্রের সামনে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা আমাদের সেই শিল্পকর্মকে ধ্বংস করে। শিল্পাচার্যের মতো, আমরা কেবল একটি সঠিক প্রশ্ন করতেই শিখি—শিক্ষক যে প্রশ্নটির উত্তর জানেন। রুটির কোন্ দিকে মাখন লাগানো আছে? প্রশ্ন এটাই।

'দ্য ডিক্লাইন অব দ্য ওয়েস্ট।' এই শব্দগুচ্ছ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কী রকম একটা বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি হয়েছিলো যেন। যে অনুভূতির কথা আমি জীবনেও কোনো-দিন ভুলবো না। যেন আইভান কারামাজভ বলছে, 'আমি ইউরোপে যেতে চাই। হয়তো আমি জানি, সেখানে কেবল এক সমাধিস্থলের দিকেই যাবো আমি। কিন্তু সে সমাধি সবচেয়ে প্রিয় সমাধি।'

'ওয়েস্ট' বা পশ্চিম বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? কেবল ইউরোপই আমার চোখে পশ্চিম নয়---উত্তর আমেরিকাও এর মধ্যে পড়ে। আমেরিকা আমাদের কাছে চিরদিনই বহুরূপী দেশ। একদিন ঠাণ্ডা, একদিন গরম, একদিন বন্ধ্যা, একদিন

উর্বর। আমাদের ইতিহাসই শুরু হয়েছে অল্পকাল আগে। এবং সে ইতিহাসের পুরোটাই নিরস এবং বিরক্তিকর। আমি যখন বলি 'আমরা,' তখন আমরা সবাই 'মায়ের ছেলে।' আমাদের গন্তব্য? তাও তো জানা আছে আমাদের। কেউ ক্র্যাকার-জ্যাক-সেলসম্যান, কেউ চুরুট-বিপনীর কেরানী, কেউ বা আবার চেইন-স্টোর ম্যানেজার। যারা একটু বুনো স্বভাবের তারা যোগ দেয় সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীতে। প্লম্বিং ইঞ্জিনিয়ার, প্লাম্বার, সুতোর বা চাষী হতে চায় না কেউই। আজ যে ট্রলি কারের কণ্ডাকটর কালকেই সে হয়তো বীমার দালাল। আবার ঘুম থেকে উঠেই হয়তো পরদিন সকালে দেখা গেলো, সে অল্ডারম্যান হয়ে গেছে।

নিয়ম, শৃংখলা, কারণ, লক্ষ্য, পরিণতি? সম্পূর্ণ অজানা অচেনা শব্দ এগুলো। আমেরিকা হচ্ছে একটি মুক্ত দেশ। কেউ তার এই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। কখখনো না। এই আমাদের বিশ্ব-বীক্ষা। জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'উবের-ব্লিক।' যা আমাদের ঠেলে নিয়ে যায় ছারপোকাদের ঝাঁকের দিকে।

'তুমি কী পড়ছো, হেনরী?'

জবাবে বইটা কাউকে দেখালেই সে বলে উঠবে, 'কি ব্যাপার হেনরী। তোমার মাথা ঠিক আছে তো? কি পড়ছো এ সমস্ত?'

কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না আমার।

ক্রনস্কির কারবারটাই ওরকম। যুবক থেকে বুড়ো হয়ে গেলো। কিন্তু স্বভাব পাল্টালো না বিন্দুমাত্র। হুমদাম কাজ করা ব্যাপারটা বলতে গেলে তার মজ্জাগত। সেদিন বিকেলে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে স্পেঙ্গলারের একটা অধ্যায় কেবল শুরু করেছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো।

'হ্যালো হেনরী।' ক্রনস্কি বলছি।

'কী ব্যাপার বুড়ো খাটাস?' হেসে উঠলাম আমি, 'কোত্থেকে এমন অসময়ে?'

'দ্যাখো, বেশি বুড়ো বুড়ো বলবে না। চুল পাকলেই মন পাকে না বুঝলে? আর তুমিও তো তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশের কোঠায় পা দেবে দু'চার দিনের মধ্যে। মেনে নিচ্ছি, আমি খাটাস। কিন্তু লক্ষী ছেলেটি, তোমার অতো সময়-জ্ঞান গজালো কবে?

'তার মানে?'

'মানে আর কিছু নয়। খুব যে অসময় অসময় বলে চ্যাঁচাচ্ছো। নতুন ঘড়ি কিনেছো নাকি?'

'বক্তৃতা রেখে আসল কথা বলো তো দোস্ত।'

'শোনো হেনরী। আমি সপরিবারে আবার একটু বাইরে যাবো। তা, ধরো দিন সাতেকের জন্যে। তোমাকে একটু আমার বাসায় এসে থাকতে হবে।'

'কি ব্যাপার? পাহারাঅলার চাকরি দিচ্ছো নাকি শেষে।'

'তা, বলতে পারো তা-ই।'

'আমার প্রাপ্তিযোগটা ?'

'ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা থাকবে তোমার কাছে। সেলারের চাবিও। কাজের ছোকরাটা দু'বেলা রান্না করবে তোমার, যদি তুমি দিনেও থাকো এখানে। কিছু টাকা লাগলে, আলমারির ভেতর একটা পুরনো পার্স পাবে। সেখান থেকে নিয়ে নিও। আমরা আটদিনের মাথায় ফিরবো। কালকেই রওনা হয়ে যাচ্ছি। কাল ঠিক সন্ধ্যার সময়। তুমি লাঞ্চ আওয়ারে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে আসতে পারো। আর--হ্যাঁ, আমি আয়রন ক্যালড্রনে ফোন করে মোনার সঙ্গে কথা বলবো। তোমার কিছু ভাববার দরকার নেই এ ব্যাপারে।'

বলা বাহুল্য, যথা সময়ে ক্রনস্কি তার বউকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর আমিও একটা ব্যাগে খানকতক কাপড় আর গোটা দুয়েক বই নিয়ে যথারীতি আস্তানা পেতেছি একেবারে ওদের বেডরুমে। আনন্দের ব্যাপার এই, শনিবার ছিলো সেদিন। কালকে রোববার। পর পর দু'দিন ছুটি যে দুটো বই ছিলো, তাতে ছুটির ব্যাপারে খুব একটা দুশ্চিন্তা ছিলোনা। কিন্তু বইয়ের পাতা ওল্টাবার সময় হলো সেই সোমবারে।

শনিবার মাঝরাত্রে খেয়ে দেয়ে, মোনার সঙ্গে টেলিফোনে দু'চারটে কথা বলে কেবল বিছানায় পা এলিয়ে দিয়েছি, হঠাৎ কান ফাটিয়ে বেজে উঠলো ডোর বেলটা। মহা ঝকমারি দেখছি। নিশ্চয়ই ক্রনস্কির কোনো আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব

কিংবা চেনাজানা কোনো লোক। বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই আমি অবাক। নেড আর ও-মারা সিঁড়ির মাঝামাঝি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে।

'তোমরা! কোত্থেকে এমন মাঝরাত্রে।' আমার গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোয় না। 'দু'জন তো ছিলে দু'জায়গায়। একই সঙ্গে কবে ফিরলে? আমার কথা নিশ্চয়ই মোনার কাছ থেকে শুনেছো?'

'বলাই বাহুল্য, আমরা এক সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসেছি এবং মোনার মুখে খবর পেয়েই এখানে এসে হানা দিয়েছি। কিন্তু ভেতরে যেতে দেবে তো?' হো হো করে হেসে উঠলো ও মারা। আমি একপাশে সরে দাঁড়াতেই প্রায় লাফ দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকলো। আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে ওদের পেছনে পেছনে ড্রয়িং রুম অব্দি এলাম। নেডের পরনে দামী পোশাক। চেহারাতেও একটা জেল্লা এসেছে। টাকা পয়সার অভাব না-থাকলেই মানুষের চেহারায় এরকম একটা আলো দেখা যায়। নেডের হাতে মস্ত বড়ো একটা ব্যাগ। ব্যাগটাও বেশ দামী। ও-মারা ও-মারাই আছে। খুব একটা পাল্টায় নি। তবে ওর পায়ের জুতো জোড়া দেখে বেশ খানিকটা চমক লাগলো আমার। এতো দামী জুতো কেনা তো চাট্টিখানি কথা নয়? ওমারাও তাহলে টাকা পয়সা কামাচ্ছে মন্দ নয়। কিন্তু জামা কাপড় বেশ পুরনো হয়ে এসেছে ওর। জুতোর সঙ্গে খুব একটা মানানসই মনে

হয় না। তবে নেড যে তার অবস্থা আমূল পাল্টে ফেলেছে, তাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ জাগবে না। রাতারাতি ভোল পাল্টে যাওয়া মানুষ আমি দেখেছি অনেক। এ ধরনের মানুষ দেখে আমার মনের মধ্যে কোনো রোমাঞ্চ হয় না।

ওদেরকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে আমি ভেতরে গিয়ে আলমারীর পাল্লা খুললাম। সেখানে সেলায়ের চাবিটা থাকার কথা। কিন্তু অনেক খুঁজেও চাবিটা পাওয়া গেলোনা। মনটা দমে গেলো। সাত সাতটা দিন তাহলে গাঁটের পয়সা খরচ করেই মদ খেতে হবে। ক্রনস্কি চতুর ও কৃপন তাতে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু আমাকে এভাবে কখনো অপ্রস্তুত করেছে বলে মনে করতে পারলাম না আমি। তবে আধ বোতল চিয়ান্তি পাওয়া গেলো আলমারির মাঝের তাকেই। পপ কর্ণের একটা প্যাকেট আর বোতলটা নিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে ঢুকলাম আমি। আমি এসব আপ্যায়ন-টাপ্যায়নের ব্যাপারে খুব একটা পরাঙ্গম নই। তাই বিরক্তিতে একরকম মুষড়েই পড়ছিলাম আমি। আমার অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো ও মারা আর নেড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেডের ব্যাগ থেকে বেরুলো তিনটে বিয়ার এক বোতল স্কচ হুইস্কি।

'গ্লাস নিয়ে এসো হেনরী।' চেঁচিয়ে বললো ও-মারা। কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই গিয়ে ঢুকলো কিচেনে। একটা ট্রের ওপর বরফ পানির জার আর তিনটে গ্লাসলেট

বসিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সে এসে ঢুকলো ড্রইংরুমে। একটা লেবুও দেখা গেলো তার হাতে।

জিনের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নেড বললো, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই হেনরী। আমরা হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি। আমাদের শোবার ব্যাপারেও কোনোরকম দুর্ভাবনার দরকার নেই। আজ সারারাত এখানে যা চলবে, তাতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার মওকা আদৌ হবে কিনা, জানা নেই। অর্থাৎ আজ রাত্রের মতো আর কি; ফলে এই ড্রইংরুমের সোফা অতঃপর কার্পেটের ওপরই রাত কেটে যাবে।'

'দক্ষিণ থেকে পাগল হয়ে এলে নাকি? নাকি হোটেল থেকেই মারিজুয়ানা টেনে এসেছো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। জবাবে পকেট থেকে পেটমোটা মানিব্যাগটা বের করে নিলো ও মারা। আর টাকার বদলে সেখান থেকে টেনে বার করলো একটা ন্যাংটো মেয়ের ছবি।

'চিনতে পারছো কি?' জিজ্ঞেস করলো নেড।

আমি বোকার মতো মাথা নাড়লাম। মাথা নাড়লাম ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম, মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে কেন? কবে, কোথায় দেখেছি তাকে? নাহ—মনে আসছে না তো? ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা পার্ক। পার্কের বেঞ্চিতে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে মেয়েটি। পা থেকে তার মাথা অব্দি এক টুকরো সুতো নেই। দুটি হাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখেছে সে ব্রেসিয়ারের ঢঙে।

অননেন্দ্রিয় চোখে পড়ছে না পায়ের ওপর পা রেখে বসেছে বলে। এ রকম বেপর্দা আমি এর আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু না, খুটিয়ে খুটিয়ে বারবার দেখেও মেয়েটিকে মনে করতে পারলাম না আমি।

'না, চিনতে পারছি না।' আমি বললাম।

'চিনবার কথাও তো নয়,' ও মারা বললো, 'অনেক দিন হয়ে গেছে তো? টাইমস স্কোয়ারের এক রেস্তোরাঁয় তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। সাংঘাতিক মেয়ে।'

'সাংঘাতিক মেয়ে? মানে?' আমি কাটা কাটা ভাবে উচ্চারণ করলাম কথা ক'টি।

'সাংঘাতিক সেক্সি।' নেড বললো, 'ছবিতে অবশ্য পুরোটা বোঝা যায় না। একটু পরেই সে আসছে এখানে। চর্মচক্ষে দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করা যাবে। তুমিও হয়তো মুখোমুখি মনে করতে পারবে।'

'এখানে আসছে, মানে---মেয়েটি' আমার বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়।

'হাবার মতো হাবভাব করছো কেন হেনরী।' ধমকে ওঠে ও-মারা। 'ডায়ানা আজ রাত্রে আমাদের নাচ দেখাবে, বুঝতে পারলে?' এক চুমুকে গবলেট খালি করে ওপেনার দিয়ে হুইস্কির বোতল খুলতে শুরু করলো সে।

ব্যাপারটা এতোক্ষণে পরিষ্কার হলো আমার কাছে। আজ রাত্রে ছুর্গ খালি পেয়ে ও-মারা আর নেড এখানে এক উৎসবের

আয়োজন করেছে। যে উৎসবের মধ্যমনি হবে ডায়ানা নামের চটকদার মেয়েটা। মন্দ কি? আমি ভাবলাম খানিকটা নিরাসক্তের মতো। খানিকটা চিত্ত-চাঞ্চল্যও অনুভব করলাম। মোনার হাত থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, অফিস থেকেও ক' দিনের ছুটি নেবো। এবং একটি সপ্তাহ উপভোগ করবো চেখে চেখে। মোনা তার প্রতিভাময়ী বান্ধবীর সঙ্গে চুটিয়ে ঘুরে বেড়াক আর্ট গ্যালারিতে। চলে যাক নদীর ধারে মারিজুয়ানা টানতে। যা খুশি তাই করুক। এমনকি শৌচ ক্রিয়ায় সাহায্য করুক। আমার কিছুই যায় আসেনা। আমি সাতটা দিন কাটিয়ে দেবো নিটশে আর স্পেঙ্গলারের সুগম্ভীর সাহচর্যে। মোটামুটি এই রকম একটা ছকই আমি এঁকে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিলো এই দুই শয়তান। আমার রাগ অবশ্য খুব বেশিক্ষন থাকলো না। বরং ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ডায়ানাকে টাইমস স্কোয়ারের কোন্ রেস্তোরাঁয় কবে দেখেছি, মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়না। অচেনা নারীর সঙ্গে যৌনচরণে স্বর্গীয় আনন্দলাভ করি আমি। যদিও আনাস্তাসিয়া আমার কাছে নতুনই, কিন্তু ওর ইন্টেলেকচুয়াল, ইন্টেলেকচুয়াল ভান আমার একদম সহ্য হয় না। তাছাড়া ওর নানাবিধ নোংরামী আমার মতো নির্লিপ্ত মানুষের মনেও ঘৃণার সঞ্চার করেছে। ছবিতে অবশ্য একজন মানুষকে ভালো

মতো চেনা যায়না। কিন্তু এই মেয়েটিকে বেশ আনন্দময়ী বলেই মনে হচ্ছে।

রাত তিনটে নাগাদ একটা মুলাটো মাস্তান ক্যাবে তুলে নিয়ে এলো ডায়ানাকে। দেখেই বোঝা যায়, মিশ্ররক্তের এই বাদামী ছোকরার প্রধান পেশাই এটা। নেডের হাত থেকে কয়েকটা কড়কড়ে কাগুজে নোট নিয়ে মুলাটো চলে গেলো। মেয়েটি স্বচ্ছন্দে এসে ঘরে ঢুকেই পা ছড়িয়ে বসে পড়লো ডিভানের এক পাশে। ও-মারা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিলো। ডায়ানা এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করেই করসেটের ফিতের গিট ঢিলে করতে শুরু করলো। তার হাবভাবে মনে হলো, খুব একটা তাড়াহুড়োয় বিশ্বাসী না-হলেও সে সময়ের মূল্যটা অন্ততঃ ভালোই দিতে জানে।

বেশ লম্বাই মেয়েটি। ও-মারার প্রায় সমান সমানই হবে উচ্চতায়। মাঝারি গড়ন। বয়েস বেশি নয়। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না-দেখলে চেহারার পোড়খাওয়া ভাবটা নজরে আসে না। মনে হয়, সন্ধ্যে থেকেই মুডে আছে সে। আজ রাতে এখানে যে মোচ্ছব হবে, সে সম্পর্কে তার সব রকমের মানসিক প্রস্তুতিই সম্পন্ন।

'হাই হাইটার!' আমার দিকে হাত তুলে মেয়েটি বললো।

আমি এবার বিস্মিত না-হয়ে পারলাম না। কবে কোথায় এক পলকের জন্যে দেখেছে, আজো মনে রেখেছে আমাকে। কেবল তাই নয়, আমি যে লেখক, সে ব্যাপারটাও সে ভোলেনি

আজ পর্যন্ত।

'হাই!' আমি সাড়া দিতে খানিকটা দেরী করলাম। ডায়ানা ত্রস্ত হাতে কাপড় চোপর খুলে ফেলে স্রেফ একটা বিকিনি পরে হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। টপলেস নয়, তবে ওটুকু ন্যাকড়া বুকের ওপর প্যাঁচানো না-থাকলেও বোধহয় চলতো। নীল আলো জ্বলা ইহুদী ব্যবসায়ীর জমকালো ড্রয়িংরুমে বিকিনি পরা ডায়ানাকে মনে হচ্ছে মৎস্য-কন্যার মতো। কেমন অপ্রাকৃত, অলৌকিক মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ পরিবেশটাকেই।

'কামন্ বয়---' আঙুল মুখে পুড়ে তীব্র স্বরে সিটি বাজালো ও-মারা। 'গো অ্যাহেড!' গমগমানো গলায় বলে উঠলো নেড। কিন্তু আমি সক্রিয় হবার আগেই ডায়ানা এসে আমার গা ঘেঁষে বসলো। তারপর কোনো ধানাই পানাই না-করে ফটাস্ করে চুমো খেলো। চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি মুহূর্তের মধ্যেই। 'হাই, রাইটার।' অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো সে। তারপর ওই দুই শয়তানের সামনেই একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচ্কা টানে আমার প্যান্টটা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিয়ে উঠলো ও-মারা ও নেড।

'রঙ-তুলি নেই। ক্যামেরাও আনিনি।' আফশোসের গলায় বলে উঠলো নেড। 'একটা স্মরনীয় মুহূর্তের প্রতিবিম্ব ধরে রাখতে পারছি না।' ও-মারা আরেকটা বোতলের ছিপি খুলতে বসলো।

কিন্তু ওদিকে আমার নজর নেই। আমি তখন জড়িয়ে ধরে আছি নীল জলাশয় থেকে সদ্য উঠে আসা একটা জলজ্যান্ত জল বন্যাকে। এক ধরনের অদ্ভুত উত্তাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমার শরীরে। বিচিত্র একটা ঘ্রান পাচ্ছি আমি। যা কোনো সেন্টের নয়। সুন্দরী রমনীদের দেহ থেকেই সাধারণত এরকম অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। মোনার শরীরেও এক ধরনের ঘ্রান আছে। তবে সেই ঘ্রাণ অন্যরকম। দশ মিনিটের মধ্যে ডায়ানা দখল করে নিলো আমাকে। আমার ইষ্টানিষ্ট ভূত-ভবিষ্যত সবই এখন তার হাতে। পনেরো মিনিটের ভেতর আমি দেখলাম, ডায়ানা আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ কার্পেটের ওপর, সম্পুর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়িয়ে বসে আছে সে। আর তার সুডোল সুঠাম উরুর তাকিয়ায় শায়িত আমি।

বিশ মিনিটের মাথায় শুরু হয়ে গেলো টর্নেডো। ডায়ানা আমাকে কোলে নিয়ে বসে ছিলো লীলায়িত ভঙ্গীতে। হঠাৎ এক ঝট্‌কায় নিজেকে বের করে নিলো আমার শরীরের নিচ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ডান স্তন দিয়ে চেপে ধরলো আমার মুখে। একটা সুগন্ধী বলের মতো স্তনের তলায় রুদ্ধশ্বাসে মরতেও যেন রাজি আমি। কিন্তু মেয়েটি ডান স্তন সরিয়ে বাঁ স্তনে চেপে ধরলো আমার প্রকম্পিত পুরুষাঙ্গ। মনে হলো, একটা বেলুন ভেদ করে চলে গেলো একখানা ধারালো ছুরি। স্তন সরিয়ে ডায়ানা মুখের ভেতর তুলে নিলো আমার শিস্ন।

চুষতে লাগলো অবিরাম।

'বাঃ মেয়ে বাহ!' সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠলো ও মারা আর নেড। 'কামকলার দেবীর দয়া হয়েছে তোমার ওপর হেনরী।' বললো নেড। 'ভাগ্যবান পুরুষ তুমি। দাওয়াত করে আনলাম আমরা—আর মজা লুটছে হেনরী মিলার।' ও মারা ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বললো।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার মুনু—ডায়ানার পুষির ভেতরে ঢুকে গেছে। আমরা গড়াগড়ি খাচ্ছি নরম কার্পেটের ওপর ওই অবস্থাতেই। কাটা স্যামন মাছের মতো ছটফট করছি আমরা। বস্তুতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য। প্রচণ্ড অন্ধ কামাবেগে উন্মত্ত দুটি প্রাণ ছাড়া এই গভীর নিশীথে পৃথিবীর আর কেউ জেগে নেই।

আমার নিমীলিত চোখের সামনে এক কালো সমুদ্র। সেখানে অনুভূতির প্রগাঢ় ফসফরাস ঝলমল করছে পরমানবিক জোনাকির মতো। আকাশ ভরা গাঢ় বেগুনি রঙা মেঘ। মাঝে মধ্যে সেখানে ঝলসে উঠছে সবুজ বিদ্যুত। একটা সাতরঙা সাপ ঘুড়ির ল্যাজের মতো আঁকাবাঁকা হয়ে পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে চলেছে মধুর সঙ্গীত-লহরীর সঙ্গে সঙ্গে।

হঠাৎ আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো কালো সমুদ্রের আলকাৎরা পানি। সেখানে দেখা দিলো একটা ঘূর্ণি। ঘূর্ণি বড়ো হতে লাগলো ক্রমশঃ। এবং আস্তে আস্তে সেখানে জেগে উঠলো অপরূপা এক জলকন্যা। একটা সোনালী রঙের

তিমি মাছের পিঠে বসে আছে সেই অপার্থিব মীন-মেয়ে—যার দেহের অর্ধেক হুবহু ডায়ানার। মুখটা নয় কেবল—গোটা দেহের মাঝামাঝি অব্দি। নিচের অংশটা অবশ্য বিশালদেহী এক রূপোলী মাছের।

কতোক্ষণ অমন মগ্ন চৈতন্যের আবর্তে পড়ে ছিলাম, জানি না। চমক ভাঙলো ডায়ানার গলার আওয়াজে। 'হাই, রাইটার।' খসখসে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা যৌনাতুর গলায় সে বলে উঠলো, 'আমাকে ওঠাও তো। আমি উঠে বসতে পারছি না।'

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসে ডায়ানাকে তুললাম। তার যোনিটা তখনো ফাঁক হয়ে আছে ইঞ্চিখানেক। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে তরল ও পিচ্ছিল যৌনরস। ডায়ানা মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে দেখছে---সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য। এ ধরনের ঘটনা সব সময় ঘটে না। যান্ত্রিক রতিক্রিয়া সম্পন্ন হয় খুবই সাধারন, সাদামাটা ভাবে। সংক্ষিপ্ত এবং ছক বাঁধা। কিন্তু কোনো কোনো সময় এই জৈবিক-মিলন হয়ে ওঠে একটা ঘটনা।

ডায়ানা এক পর্যায়ে যোনির ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকা রতিরস মুখে মাখলো নিজের। খানিকটা সে মাখিয়ে দিলো আমার মুখেও। আশ্চর্য, প্রথমে মনে হয়েছিলো গা গুলোবে। কিন্তু সেরকম কোনো অনুভূতি হলো না। বরং মৃগনাভির সঙ্গে চাঁপা ফুলের গন্ধ মেশালে যে রকম ঘ্রাণ জন্মায়—ঠিক সেরকম একটি অনৈসর্গিক ঘ্রাণে মনপ্রাণ যেন ভরে গেলো

আমার। মনে হলো, অনন্তকাল যদি ওই অমৃত সুধা সে আমার মুখের ওপর লেপন করতে থাকুক। কোনোরকম বিরতি যেন না ঘটে।

কিন্তু ডায়ানা আমাকে ধরে নিয়ে বেডরুমে এলো। তারপর শুইয়ে দিলো বিছানায়, আলতোভাবে। গাঢ় গভীর চুম্বনে আমাকে নতুনভাবে রোমাঞ্চিত করে সে স্খলিত পায়ে হেঁটে গেলো ড্রইংরুমের দিকে। জানি, সেখানে মুখ ব্যাদান করে বসে আছে দুই ক্ষুধার্ত কুকুর। এও জানি, সেই দুই ক্ষিপ্ত সারমেয়কে শান্ত করবে অনতিবিলম্বে। ডায়ানার বিষণ্ণ নগ্ন হেঁটে যাওয়া দেখে বুকটা দুলে উঠলো আমার। বড়ো মায়া হলো ওর জন্যে। ইচ্ছে হলো, এক্ষুনি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে বাধা দিই ওকে। যাতে ও ড্রইংরুমে যেতে না পারে। কিন্তু পারলাম কই? বরং আরো শীতল, আরো ক্লান্ত শরীর বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম আমি। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে—এছাড়া কিছু করনীয়ও তো নেই আমার। মানুষের নিয়ম নীতির ব্যতিক্রম ঘটানো যায় ইচ্ছে করলেই। কিন্তু নিয়তি পাল্টাবার শক্তি আছে কার?

সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেলাম। ক্রুনস্কির মস্ত-বড়ো বেডরুমে, ঢাউস জোড়া-বিছানায় আমি একলা পড়ে আছি। আশেপাশে কেউ নেই। অবাক হয়ে ভাবলাম, আমি সারারাত একটি অনিন্দ্যসুন্দর স্বপন দেখেছি। কৌতূহল বেড়ে যাওয়ায় আমি ড্রইংরুমে গিয়ে উঁকি দিলাম। না, কেউ নেই

সেখানে। কোথায় ডায়ানা, কোথায় ও-মারা কিম্বা নেড। এমনকি নৈশ মত্ততার কোনো চিহ্ন পড়ে নেই কোথাও। নেই মদের বোতল, পপকর্ণের প্লেট কিম্বা গ্লাস।

নিঃসন্দেহ হলাম, ডনের গলার আওয়াজ কানে আসার পর। সে ভোর বেলায় এসে কাজ শুরু করে দিয়েছে কীচেনে। ডিম ভাজবার শব্দ হচ্ছে সসপ্যানে। কফির ঘ্রাণ ভেসে আসছে বদ্ধ বাতাসে। বুঝতে বিলম্ব হলোনা, শেষরাত্রের দিকে সদ-লবলে কেটে পড়েছে ও-মারা। যাওয়ার আগে বুদ্ধিমানের মতো নিশ্চিহ্ন করে গেছে নৈশ-তাণ্ডবের যাবতীয় স্বাক্ষর। যদি তারা তা না-ও করে থাকে ডন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো পর-পরিস্কার করে রেখেছে সবকিছু। খুব বুদ্ধিমান ছেলে ওই ডন। ওকে বেশ শাঁসালো একটা বখশিস আমার না-দিলেই নয়। বেডরুমে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। রাত্রি জাগরনের কারণে বড়ো অবসন্ন লাগছিলো শরীর। ডায়ানার মুখটা হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো ভেসে উঠলো মনশ্চক্ষে। তারপর দ্বিতীয় বারের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিলো বারবার। টেলিফোন বেজে উঠ-ছিলো বড়ো ঘন ঘন। সবই ফালতু ফোন। ক্রনস্কিকে চায়। ক্রনস্কি নেই, ক্রনস্কি নেই। বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে ডাকলাম ডনকে।

'ডিয়ার ডন।'

'বলুন স্যার।

'ফোনটা কি তুলে রাখবে ? নাকি তার কেটে দেবে ?'
'আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি স্যার।' ডন বললো। তারপর সেটাকে টেনে নিয়ে গেলো ভেতরের দিকে। একেবারে বাগানের গা ঘেঁষে, যে ছোট্ট ঘরটা সবসময় বন্ধ থাকে সেখানে নিয়ে আটক করলো সে টেলিফোনটা। তারপর দরজা আটকে দিলো শক্ত করে।

চৈনিক জ্ঞানবৃদ্ধের ছবিটা কনুইয়ের নিচে রেখে লিখবার সময় ও মারার ফোন এসেছিলো কাল। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া সেরে কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে বসেছিলাম। টেনে নিয়েছিলাম আবার সেই ছবিটা।

ছবিটা দেখে মাঝে মধ্যেই কেমন চমকে উঠছিলাম আমি। হয় ফটোগ্রাফার জানেনা ছবিটা কার, অথবা বৃদ্ধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নিজের নাম। আমরাও তো যা জানি, তা খুবই সামান্য। আমরা কেবল জানি উনি পিকিংয়ের মানুষ। আমি তাঁর ছবির দিকে তাকালেই আমার মনে হচ্ছে, উনি এই ঘরের মধ্যে আমার ঠিক সামনে বসে আছেন।
ফটোগ্রাফের মধ্যে এমন জীবন্ত মানুষ আমি এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। তিনি যে কেবল নিজের দেহমনেই এক প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, তা নয়। তিনি নিজেই একটা মূর্তিমান আধ্যাত্মিক

শক্তি। আমি বিনা দ্বিধায় বলবো একথা। সেই শক্তি। যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাঁর অভিব্যক্তিতে। একটি বাক্যই যেন উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর মুখ থেকে : জীবন পরম আনন্দময়।

ইতিহাসের শরীর বিন্যাসে এই জ্ঞান বৃদ্ধের কিছু আসে যায় কি ? মনে হয়না।

বৃদ্ধ কি সর্বাঙ্গ সুন্দর ? আমি তা মনে করিনা। নানা রকম খুঁত এসে জড়ো হতে থাকে তাঁর মুখের ওপর।

মোনার কিছু কিছু খুঁত যেমন আমার কাছে ধরা পড়তে শুরু করেছে ইদানিং। আগে তো ওকেও আমার মনে হতো নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর। মনে হতো বিধাতা নিজের হাতে, পরম যত্নে গড়েছেন ওর মায়াবী শরীর। শরীরের যেখানে যা দরকার তা সংযোজন করেছেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। এবং কেবল দেহ নয়, মনটাও। আমার ত্রিশোর্ধ এই বোহেমীয় জীবনে কম নারীর সংস্পর্শে আসিনি। ষোলো বছরের বালিকা থেকে চল্লিশোর্ধ রমনীও সেই তালিকায় রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী। গুনবতী। কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর বলা চলে না তাদের কোনো মতেই। মোনার মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার সবগুলো পছন্দ সই ব্যাপার।

মোনা লেসবীয় নয়তো ?

অকস্মাৎ চমকে উঠি আমি। আনাস্তাসিয়াকে নিয়ে সে ইদানীং যা শুরু করেছে, তাকে কোনো অর্থেই সুস্থতার লক্ষণ বলে মনে করার উপায় নেই। বাড়াবাড়ির একটা সীমা

আছে। সীমা আছে আদিখ্যেতার। মোনা মনে হয়, সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে ইতিমধ্যেই। কেননা স্তাসিয়া নামের একটি অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে নিজের স্নেহার্দ্র হৃদয়ে ঠাঁই দিয়ে সে আমাকে পর্যন্ত উপেক্ষা ও অপমান করছে। আমি নানা অদৃশ্য কারণে নিজেকে তুলে ধরতে পারছি না সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার ভেতরে যে শক্তি আছে, সেটা অনুভব করার মতো মগজটুকু অন্ততঃ আমি রাখি। আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর একজন জানে সেই গভীর খবর। সে হচ্ছে মোনা। মোনার চোখের সামনে আমি কাচের মতোই স্বচ্ছ। অথচ সেই মোনা কিনা একটা স্নানহীন, দুর্গন্ধ মেয়েকে প্রতিভাবান কবি বলে পরিচয় করিয়ে দেয় আমাকে। তার মতো আঁকিয়ে, তার মতো নাচিয়েও নাকি আর হয়না। অথচ আমি তো মোনার অনেকখানিই চিনি। যতো-দূর জানি, তাতে পৃথিবীর কারো কাছেই আমাকে ক্ষুদ্র করার প্রবৃত্তি তার কোনোদিনও হবেনা। তাহলে কোন্ অনু-প্রেরনায় সে উপকুল অঞ্চল থেকে উড়ে আসা কাকের মতো ওই এলোমেলো মেয়েটাকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করেছে।

লেসবীয় রমনীরা নাকি পুরুষদের প্রতি যৌনগত ভাবে নিরাসক্ত হয়। কিন্তু মোনার সঙ্গে দৌহিক মিলন কালে এরকম কোনো অনুভূতি জাগেনি আমার মনে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর তার প্রতিটি যৌনাঙ্গ। তার গালে একবার চুমো খেলে, সেখানে রক্তিম আপেল জেগে থাকে অন্ততঃ তিন ঘন্টা। ঠোঁট চুষলে,

সেখানে ফুটে থাকে অনন্য গোলাপ। তা সারাদিন তো বটেই। তার নিতম্বের সামান্য একটু ছোঁয়ার জন্যে আমি আত্মহত্যা করতে পারি হাসতে হাসতে। সঙ্গমকালে মোনার নাভির চারদিকে যে আলোর বলয় ফুটে উঠতে দেখি---তা কেবল সূর্য গ্রহনের সময় সূর্যের চতুর্দিকেই দেখা যায়। লেসবীয় নারীর কাছ থেকে এসব আশা করা চলে না কোনো কালেই। তাহলে?

তাহলে স্তাসিয়ার জন্যে জীবনটাকে অমন জটিলতার ভেতর নিয়ে গেলো কেন মোনা? ক্রনস্কির বাড়িতে সাত দিনের জন্যে এসে উঠেছি আমি। ক্রনস্কি প্রস্তাব দেয়ার সঙ্গে আমার রাজি হয়ে যাওয়ার পেছনে আমার কোনো গোপন অভিমান কি সক্রিয়? মোনার কাছে ক্রনস্কির কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মুখটায় তার ছায়া ঘনিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তা ছিলো খুবই অল্প সময়ের জন্যে। অন্য সময় হলে ওর মুখের ছায়াটা অমন মুহূর্তের মধ্যে অপসৃত হতো না। সময় নিত বেশ খানিকটা। কিন্তু সাত দিনের আমার এই অন্যত্র বসবাসের খবরে সে বেশ স্বস্তি পেলো বলেই তো মনে হলো। যেন সাতটা দিন সে পুনরাবৃত্তির বাইরে একটু খানি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। সাতটা দিন সে একান্তভাবে আপন করে পাবে আনাস্তাসিয়াকে।

লেসবীয়দের লক্ষণ কি? কাকে একথা জিজ্ঞেস করবো। বুড়ো বাবার সংগে অনেক সময় অবশ্য বন্ধু ভাবেই কথাবার্তা বলি

আমি। কিন্তু এই প্রশ্নটা তাকে কিছুতেই করা যাবেনা। মোনাকে সে-ও খুব ভালোবাসে। অন্ততঃ এই একটি কারণেই বাবার কাছে জিজ্ঞেস করা যাবেনা সমকামিনীদের খুটিনাটি সম্পর্কে। নির্ঘাত আঁচ করে ফেলবে তাহলে বুড়ো।

তাহলে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ওয়েলডনকে একবার জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। নিজেকে অমন উলংগ করে অন্যের সামনে তুলে ধরা কতোখানি যুক্তিযুক্ত-- তা জানিনা। কিন্তু দুষ্প্রাচ্য দর্শনের বড়ি অনায়াসে হজম করে এখন যদি ইঁদুরের মতে পিছলে পড়ি-- বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব প্রীতিকর হবেনা।

গোল্লায় যাক লেসবীয়রা। কয়েকটি মাত্র অস্পষ্ট কারণে মোনাকে লেসবীয় ভাবা ঠিক হচ্ছে না খুব সম্ভব। আমার বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা উচিত বোধহয়। দেখাই যাক না, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। আকাশে মেঘ দেখে ঘাটেই জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার কোনো অর্থ হয়না। মোনার জন্যে অন্ততঃ এই অপেক্ষাটুকু করা যেতে পারে।

আসুক ক্রনস্কি ফিরে। আমি লাইব্রেরীতে বসে আমার প্রশ্নের জবাবটা ধীরেসুস্থে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করবো। যদিও গ্রন্থকীট হবার ইচ্ছেটা আমার আদপেই নেই। কিন্তু বই ছাড়া তো কোনো গত্যন্তরও আবার দেখিনা। ঠিক আছে। তাই হবে। ফ্রয়েডটাকে আর একটু ঘাঁটাঘাটি করে আমি চলে যাবো ভারতীয় কামসূত্রে। দেখবো, এ ব্যাপারে কে কোথায় কি বলেছে। অবশ্য মীথগুলো আমার পড়া আছে।

পড়া আছে কবিতা গুচ্ছও। কিন্তু মোনাকে সেইসব ছকের কোনোটিতেই ঠিক ফেলতে পারছি না আমি।

আচ্ছা, ব্যাপারটা খুবই বিদঘুটে মনে হয় না।

ছেলেরা ছেলের সঙ্গে শুচ্ছে। মেয়েরা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেয়েদের সঙ্গে। ভাবা যায়? কিন্তু সবকালে এবং সব দেশেই দেখা যাচ্ছে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। আমি অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি সমকামী পুরুষদের কথা। কিছু কিছু সমকামী সম্পর্কে যে আমার নিজেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, তেমন নয়। কিন্তু লেসবীয় শব্দটি আমার কানে এসেছে অনেক পরে। অবশ্য এই শব্দটির আওতায় যে মেয়েগুলো পড়ে, সেরকম মেয়ে একাধিক দেখেছি বাল্যকালেই। প্রায়ই তো দেখতাম, একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি শুয়ে জড়াজড়ি করছে সাপের মতো। কিন্তু ব্যাপারটায় নিগলিতার্থ বোঝার সাধ্য আমার ছিলোনা তখন।

কাজকর্ম সেরে ডন চলে গেছে। আমি জনশূন্য এই বাড়ির ভেতর বেড়াচ্ছি প্রেতাত্মার মতো। যেন জেল-জীবন যাপন করছি আমি। অথচ ক্রনস্কি বলেছিলো রাতে এসে এখানে থাকতে। সব শেয়ালের এক রা, সব ইহুদীরই তেমনি একই রকম গৃহসজ্জা। আমি ইহুদী নই। কিন্তু মোনা ইহুদী ফলে আমার বাসাও এই বাসারই এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। যাই হোক, ক্রনস্কির এই বাড়িটা তার নিজের। ব্যবসায়ী মানুষ। ইহুদীসুলভ কৃপণতার ফলে অতি-সঞ্চয়ী মনোভাব গ্রাস করে ফেলেছে

একদার প্রাণবন্ত এই মানুষটিকেও। কথায় কথায় সে টেনে আনে কেবল লাভ লোকশানের প্রসঙ্গ। জমিটা ছিলো ওর দাদার। ওর বাপ ছিলো ওই বুড়োটার একমাত্র সন্তান। ফলে নিউইয়র্কের মতো শহরে বেশ খানিকটা জমি পেয়েছে সে উত্তরাধিকার সূত্রে। চাকরি করে টাকা জমেছিলো ওর স্বভাবের কারণেই। তাই ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজের বানানো বাড়িতে এসে উঠেছে কয়েক বছর যাবৎ।

ক্রনস্কির বাড়িটা দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু বোকাসোকা মনে হয় যেন কেমন। খানিকটা খরুচেও। আমি গেলেই দামী মদ পরিবেষণ করে আমার সামনে। বিশেষ করে ক্রনস্কি যদি বাড়িতে না থাকে। আমি যখন অলসভাবে ঠোঁটের সামনে গ্লাস তুলে ধরি, ক্রনস্কির বউ জোকাস্টা আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। কেন থাকে কে বলবে। একবার এক ইহুদী পরবে জোকাস্টাকে আমি একটা বই প্রেজেন্ট করেছিলাম। ভীষণ খুশি হয়েছিলো সে। আমাদের আশেপাশে জোকাস্টার মতো দু'একটা ভালো মানুষ আছে বলেই তো পৃথিবীটা এখনও সুন্দর।

বেডরুমের দেয়ালে দেখতে পাচ্ছি জোকাস্টার কম বয়সের ছবি। দারুন সুন্দরী ছিলো। ক্রনস্কির মতো একটা বুড়ো ভোঁদড় যে এমন কল্যাণময়ী একটি স্ত্রী পেয়েছে, তা ওর জন্যে সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। বারবার আমার মনে হচ্ছে রাত্রের ঘটনাটা। এরকম অদ্ভুত ঘটনা অল্পই ঘটে বোধহয়। যেন

আদিরসাত্মক একটা ফিল্ম দেখেছি রাত্রে। অথবা পড়েছি ওই ধরনের কোনো বই। আমি পূর্ণ-তৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ও-মারা আর নেড ডায়ানাকে নিয়ে এমন নিখুঁতভাবে কেটে পড়েছে যে, এবাড়ির কাজের ছোকরা ডনও খুব সম্ভব বুঝতে পারেনি কিছু। ডায়ানার সংগে দু'চারটে কথা হতে পারতো অবশ্য ব্রেকফাস্ট টেবিলে। তাতে ভালো বই মন্দ লাগতো না আমার। কিন্তু তাতে সুদূরপ্রসারী কোনো ফলাফল অর্জিত হতো কিনা সন্দেহ। উপরন্তু ডন এই সমাবেশের খবর জেনে ফেলতো, যা ক্রনস্কিরও জেনে ফেলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো না। আর ক্রনস্কি যে ধরনের সাত্ত্বিক মানুষ, তাতে তার বাড়িতেই এই ধরনের কুকর্মের খবরে আমার ওপর সে খুশি হতো না বোধহয়। অবশ্য ক্রনস্কিকে নিয়ে সামান্যই মাথা ঘামাই। আমার ভয় জোকাস্টাকে। তার নিজের হাতে গোছগাছ করা ঘরের মধ্যে আমি এরকম একটা তাণ্ডবলীলাকে প্রশ্রয় দিয়েছি শুনলে কি ভাবতো সে। ছিঃ। ও-মারার শানিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না আমি। যে প্রশ্নগুলো আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তা হচ্ছে -- ডায়ানা মেয়েটির সংগে আবার আমার সাক্ষাত হতে পারে কিনা। ও-মারা আর নেড কি ছুটি কাটাতে নিউ ইয়র্ক এসেছে-- নাকি চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়েই চলে এলো। অথবা চাকরি চলেই গেছে তাদের! আশ্চর্য-- এ সম্পর্কে ওদের সংগে কথা বলারও সময় হয়নি আমার। আসলে,

ডায়ানার অভাবিত আবির্ভাব এবং তার উষ্ণ সম্বোধনে সব-কিছু গুলিয়ে গিয়েছিলো আমার। ওরা এসে এ বাড়িতে ঢোকার আগ-মুহূর্তে আমি দু'জন কীর্তিমানকে মনের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। গ্যেটে আর স্পেঙ্গলার। পৃথিবীর যাবতীয় যুক্তি এসে মাথার ওপর ভীড় জমাচ্ছিলো মাছির ঝাঁকের মতো। ওদের আকস্মিক আবির্ভাবে ভাবনার তাল কেটে গেলেও-- ঘোর কাটতে সময় লেগেছে। ফলে গ্যেটের দর্শন থেকে এক লাফে ডায়ানার উলঙ্গ দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে-- মাঝখানে একটা শূন্যতাকে প্রশ্রয় পেতে দিয়েছি আমি। কাজেই এতোদিন পর দেখা হলেও কুশলাদি বিনিময়ের সুযোগ পর্যন্ত পাইনি আমরা।

ডায়ানার কথা মন থেকে আমি তাড়াতে পারছি না কিছুতেই। বারবার চোখের ওপর ভেসে উঠছে কালো ঢেউয়ে ভরা সেই সমুদ্রটা। যেখানে ঘূর্ণি তুলে জেগে উঠেছিলো একটি জলকন্যা। ডায়ানাকে আমার হঠাৎ করে এতোটা ভালো লেগে গেলো কেন, বুঝতে পারছি না ঠিক। কী রহস্য আছে এর পেছনে? কিন্তু রহস্যের জট পরে খোলা যাবে। আপাততঃ ক্রুনস্কি এসে পড়ার সংগে সংগে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে বাইরে। ডায়ানাকে আমি চাই না অবশ্য। আমার সোনা আছে। কিন্তু ডায়ানার সাহচার্য কিছুদিনের জন্যে অপরিহার্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। যেন অলৌকিক

কোনো চিকিৎসার মাধ্যমে ওই মেয়েটি আমাকে রোগ মুক্ত করে তুলবে।

পরের ক'টা দিন কিভাবে কেটে গেলো আমি জানিনা। ক্রনস্কি আর ওর বউ এসে বাড়িটা ঘুরে দেখে খুব খুশি। যেমনটি রেখে গেছে, তেমনটিই আছে সবকিছু। একটা সূঁচ পর্যন্ত নড়েনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

'বা, চমৎকার ছিলে মনে হচ্ছে ছোকরা?' ক্রনস্কির সাহাস্য-মন্তব্য।

'তা ছিলাম। কিন্তু মদের সেলারের চাবির ব্যাপারটা কি গালগল্প?'

'তার মানে? চাবিটা তুমি পাওনি?' ক্রনস্কি চিন্তিত মুখে বিব্রতভাবে উঠে গেলো আলমারির সামনে। ত্রস্তহাতে পাল্লা খুলে হাতড়াতে লাগলো এখানে ওখানে। 'আশ্চর্য এই খানেই তো ছিলো চাবিটা—' ক্রনস্কির গলা দিয়ে যেন শব্দ বের হয় না। 'এই তো, এই তো রয়েছে চাবিটা?' হঠাৎ খুশি খুশি গলা শোনা গেলো ওর। একটা চীনে মাটির পুতুলের নিচ থেকে একরত্তি চাবিটা রিংসুদ্ধ বের করে আমার নাকের সামনে দোলাতে লাগলো সে পেণ্ডুলামের মতো।

আমি তো তাজ্জব। ওই পুতুলটার নিচে অন্তত তিনবার খুঁজেছি।

'নিয়ে আসবো একটা পুরনো চিয়াস্তি?' চাবিটা দোলাতে দোলাতে বললো ক্রনস্কি।

কিন্তু আমি কি বলবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ক্রনস্কি কি একটা মায়াপুরীর মধ্যেই বন্দী করে রেখে গিয়েছিলো আমাকে? নাকি যাদুদণ্ড মাথায় বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিলো। নইলে এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটে কি করে? কথাটা ভাবতে গিয়ে সারাটা শরীর শিউরে উঠলো আমার। সেদিন রাত্রে কারা এসেছিলো? নাকি—সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ক্রনস্কির এই চাবির মতোই রহস্যময়? ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিই কি ভাবে?

'কী ব্যাপার? রাগ করলে হেনরী।'

'হ্যাঁ।'

'কী বললে? তোমার আবার রাগ আছে নাকি?'

'না।'

'কী হয়েছে তোমার। শরীরটা খারাপ হয়নি তো। ভালো ঘুমিয়েছো তো রাত্রে!'

কিন্তু ক্রনস্কির কৌতূহল মেটাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আপাতত আমার নেই।

আমি ডনকে ডাকলাম। একটু আগেই সে এসে লন-মোয়ারে গ্রিজ মাখাচ্ছিলো।

'ডন, প্রথম দিন সকালবেলা তুমি এ বাড়িতে এসে আমি ছাড়া আর কাউকে দেখেছিলে?'

'না তো।'

'কী বলছো আবোল তাবোল।' আমি একেবারে পাগলের মতো লাফ দিয়ে উঠি সোফা থেকে। 'আরো দু'জন পুরুষ আর তাদের সঙ্গে একটি মেয়েকে ছাখোনি তুমি?'

'কই, দেখিনি তো স্যার।'

'আচ্ছা, ড্রইংরুমে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর বোতল গ্লাস কিংবা প্লেট পেয়েছিলে?'

'একেবারেই না। স্যার কি বলছেন আপনি এসব। ডুপ্লিকেট চাবিটা ছিলো আমার কাছেই কেবল। আমি এসেছি ওইদিন সকাল সাড়ে ছটায়। এসে দরজা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখি—বেডরুমে আপনি গভীর ঘুমে ডুবে আছেন স্যার! আশেপাশে কাকপক্ষীও তো ছিলোনা। অথচ আপনি বলছেন---' জোকাস্টা এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। চেয়ে আছে তার সেই স্বভাবসুলভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই। ক্রনস্কি আমার কপালে হাত দিয়ে খুব সম্ভব তাপ পরীক্ষা করলো। চোখের পাতা সরিয়ে দেখলো চোখের রং। তারপর মাথার ওপর হাত বুলাতে লাগলো নিরবে।

'আমি দুঃখিত ক্রনস্কি।' বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়ালাম আমি। 'তোমরা বাড়ির ভেতরে পা দিতে না দিতেই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছি দুজনকে। আসলে ব্যাপার তেমন গুরুতর কিছু নয়। চাবিটা হয়তো বা আমি খুঁজিই নি তোমাদের আলমারিতে।

স্বপ্নটপ্ন দেখছিলাম বোধহয়। আচ্ছা, ভালো কথা, আধ বোতল চিয়ান্তি কি রেখে গিয়েছিলে তোমরা আলমারিতে?'

'কস্মিনকালে না।'

'বুঝতে পেরেছি, ঘোরতর এক দুঃস্বপ্নই তাহলে আমি দেখেছিলাম ওইদিন। তা, সেসব কথা এখন থাক। আমি দিব্যি ছিলাম তোমাদের বাড়িতে। জানো, ভাড়াটে বাড়ি আর এই ধরনের বন্ধুর বাড়িতে থাকার মধ্যে মস্তবড়ো একটা তফাৎ লক্ষ্য করেছি আমি। কেমন যেন অন্য রকম লাগে পুরোপুরি।'

'এই তো, এবার আত্মস্থ মনে হচ্ছে তোমাকে।' জোকাস্টা ডনের হাত থেকে কফির ট্রেটা নামিয়ে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখলো। তার মুখে হাসি ফুটেছে এতোক্ষণে।

'তা তোমরা কীরকম বেড়ালে টেরালে? খুব ফুর্তি হয়েছে, তাই না?' আমি জোকাস্টার দিকে তাকিয়ে বললাম।

'খুব মজা করে ঘুরে বেড়ালাম পশ্চিমের মরুভূমিতে। এর আগে আমি ওদিকটাতে আর কখনো যাইনি।' জোকাস্টা বলতে লাগলো, 'তবে বইয়ে, কমিকসে বা সিনেমায় যেরকম দেখেছি-- সেরকম মনে হলো না জায়গাটাকে। সব চেয়ে যা ভালো লেগেছে, তা হলো---অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা। পাহাড় মরুভূমি আর ঘাসে ভরা প্রান্তরের যে রূপ দু'চোখ ভরে দেখে এলাম, তার তুলনা নেই। কাউবয় অবশ্য চোখে পড়েছে অনেক। কিন্তু তারা অনেকেই হেলিকপ্টার দিয়ে গরু তাড়িয়ে নেয় ঘোড়ার বদলে। রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ

দেখিনি। কিম্বা চোখে পড়েনি গান ম্যানদেরও। চমৎকার শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। স্বপ্নের মতো ছোট ছোট শহর-গুলো দেখে এতো ভালো লাগে। আমি অনেক ছবি তুলে এনেছি ক্যামেরায়। প্রিন্ট করে দেখাবো তোমাকে।'

'তুমি যাওনি কখনো ওদিকটায় ?' জিজ্ঞেস করলো ক্রনস্কি।

'আমি যেতে চাই না।'

'আরে বুনো-পশ্চিম না দেখলে যে আমেরিকা দেখাই বৃথা।'

'আমি আমেরিকা দেখতে চাই না।'

'ও, বুঝতে পেরেছি।' ক্রনস্কি বললো, 'তুমি পছন্দ করো ইউরোপ। তাই না ? তোমার ফ্রান্স যাওয়ার কথা শুনে-ছিলাম মোনার মুখে। সে ব্যাপারে কদ্দূর এগুলে ভাই।'

'যাবো। তৈরী হচ্ছি।'

'আমাদের কথা ভুলে যেওনা আবার। যা ভুলো মন তোমার। প্যারিসে একটা বই নাম করলে, প্রকাশকরা তো তোমাকে ছেঁকে ধরবে। লিখতে লিখতে নাওয়া খাওয়ার সময় পাবে না, বুঝলে ? আর অমন ব্যস্ত থাকলে, আমাদের মতো অধমের কথা তোমার মনে থাকবে কেন ?'

ক্রনস্কি এমন ভাবে কথা বলছে, যেন, প্যারিসে সে অনেকদিন ছিলো। সেখানকার শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে ছিলো তার অবাধ আনাগোনা।

'প্রথম বইটা যদি তোমাকে উৎসর্গ করি-- কেমন লাগবে তোমার।'

'ও, তাই বুঝি?' লাফিয়ে উঠলো ক্রনস্কি। তারপর ধীরে সুস্থে সোফায় বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলো আলতো-ভাবে।

'আমি তাহলে খুশি হবো নিশ্চয়ই? কিন্তু পয়লা বইটা মোনাকে উৎসর্গ করাই উচিত হবে তোমার। আমাকে করো দ্বিতীয় বা তৃতীয়টা না, তাও নয়। তোমার মাবাবাকেও মনে রাখা দরকার। বিশেষ করে তোমার বুড়ো বাপ লেখক হবার ব্যাপারে তোমাকে সবচেয়ে বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমি সব খবর রাখি। সুখের দিনে তাদের কথা ভুলে যাবে? তোমার বাবা তো এখনো বই টই পেলেই পড়েন।'

আমি একথার কোনো জবাব দিলাম না।

যেন মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেলাম আলোকোজ্জ্বল এক ধূম্র-কুণ্ডলীর মধ্যে। কে যেন মায়াবী গলায় প্রশ্ন করলো আমাকে: 'তুমি কে?'

'আমি একজন সুখী মানুষ।'

'পৃথিবীতে এসে কীরকম উপভোগ করলে এই গ্রহটিকে?'

'নিজের জীবনটাকে আমার মনে হয়েছে এক দীর্ঘ ও পোলাপ-ময় ক্রুশকাঠ হিসেবে।'

আমি জানি, বক্তব্যটা আমার খুব পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে পারলাম না। কিন্তু ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাবেই জানিয়ে দেয়া উচিত ওই অপ্রাকৃত প্রশ্ন কর্তাকে।

এক সময় আমি ভাবতাম, আমার মতো ক্ষতবিক্ষত মানুষ

পৃথিবীতে আর একটাও নেই। আমি যন্ত্রনার কথা তুলে ধরার জন্যেই লিখতে চেয়েছিলাম একটা বই। কিন্তু লিখতে শুরু করার অনেক আগেই আমার ক্ষতটা আরো বেশি বিস্তৃত হলো। যন্ত্রনাও বৃদ্ধি পেলো বহুগুণে।

আমি কি তাহলে রাস্তা বদলাবো?

নিজের ক্ষতস্থানটি মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরবো সরাসরি? পাশাপাশি আরো অসংখ্য মানুষের ভেতরকার ক্ষত স্থানগুলোও?

যন্ত্রনা জিনিসটা খারাপ নয়। কিন্তু ভ্রান্তিজনিত যন্ত্রনার কোনো অর্থ হয়না। বৌদ্ধরা যেমন যন্ত্রণা সম্পর্কে হাজির করেছে এক অন্য রকম দর্শণ। বোধি। নির্বাণ। আরো কতো সুন্দর শব্দ ছড়িয়ে দিয়েছে তারা চারদিকে।

আসলে দুঃখকষ্ট ভোগ করা ব্যাপারটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরর্থক। যন্ত্রণার স্বরূপ চেনার জন্যেই তার খপ্পরে পড়া যেতে পারে বোধহয়। মনে হয়, ধারনাটা পরিস্কার হবার পরেই কেবল জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কে ঝাপসা ছবিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। জীবন বৃক্ষটি কেবল অশ্রুর সিঞ্চনেই বেঁচে থাকেনা। বেঁচে থাকে এই বোধের মাধ্যমেও যে, মুক্তিই একমাত্র চিরস্থায়ী।

— — —